পচাত্তরের পনেরই আগষ্ট

মেজর মোখলেছুর রহমান (অবঃ)

পচাত্তরের পনেরই আগষ্ট | মেজর মোখলেছুর রহমান (অবঃ)

THE

BANGLADESH GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

FRIDAY, SEPTEMBER 26, 1975

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF B...LADESH

MINISTRY OF LAW PARLIAMENTARY AFFAIRS JUSTICE

(Law and Parliamentary Affairs Division)

NOTIFICATION

Dacca, the 26th September 1975.

No. 692-Pub. – The following Ordinance made by the ...dent of th... ...ople's Republic of Bangladesh, on the 26th September, ... is hereb... ...blished for general information:–

THE INDEMNITY ORDINANCE, 1975

Ordinance No. XLX of 1975

an

ORDINANCE

...restrict the taking of any legal or other proceedings ... ...ts or things done in connection with, or in prepara... ...an for, or steps necessitating, the historical change a... ...artial Law on the morning of the 15th August, 1975.

WHEREAS it is expedient to restrict the taking of a... ...edings in respect of certain acts or things done in con... ...eparation or execution of any plan for, or steps necessita... ...ange and the Proclamation of Martial Law on the mornin... 1975;

AND WHEREAS Parliament is not in session and the Presi... ...at circumstances exist which render immediate action necessa...

(2705)

...poses of this section, a certificate by the President, or a ... him in this behalf, that any act, matter or thing was ... any person mentioned in the certificate in connection ... or execution of any plan for, or as necessary step to... ...vernment of the People's Republic of Bangladesh and ...ial Law on the morning of the 15th August, 1975, ... of such act, matter or thing having been done or ...onnection with, or in preparation or execution of ...tep towards, the change of such Government and ...aw on that morning.

KHANDAKER MOSHTAQUE AHMED
President

M.H. RAHMAN
Secretary.

...desh Government Press, Dacca
Bangladesh Forms & Publications Office

ISBN. 984-11-0410-3

পঁচাত্তরের পনেরই আগষ্ট

মেজর মোঃ মোখলেছুর রহমান (অব:)

আহমদ পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক
মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭ জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা-১১০০

এ. পি. এইচ
প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৪০২/ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

ISBN. 984-11-0405-2

মূল্য
সত্তর টাকা মাত্র

মুদ্রণে
মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭ জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা-১১০০

ভূমিকা

দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। কিন্তু সে ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক পর্দার অন্তরালে থেকে যায়। যারা তাঁকে চিনেন জানেন তাঁরা মুখ খুলতে রাজি নন। তাই বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিশ বছর পরেও মূল নায়ক চিহ্নিত হয়নি। এক একজন এক এক জনের নাম বলছেন। এ বইটিতে আমি মূল নায়ককে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছি। কাজটি সহজ ছিল না কিন্তু বিবেকের তাড়নায় তা করেছি। পাঠককূল বিশেষকরে নতুন প্রজন্ম উপকৃত হলে নিজকে ধন্য মনে করবো।

পনেরই আগষ্ট হত্যাকাণ্ড এবং তার পরবর্তী কর্মকাণ্ড জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। দেশের অগ্রগতির চাকাকে করেছে পশ্চাৎমুখী। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধান হয়েছে অপবিত্র। বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সামরিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বাধীনতা বিরোধিরা সর্বস্তরে দাপটের সঙ্গে বিরাজমান, শাসন ক্ষমতা এক বিশেষ বলয়ে হয়েছে খাঁচাবন্দী। শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসীদের নিকট হয়েছে জিম্মি, কিন্তু এতো সবের মধ্যেও বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের দাবীতে রাজপথ মাঝে মধ্যে হচ্ছে উত্তপ্ত। জেনারেল জিয়া আইন করে সে বিচারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক কারবালার শহীদ হজরত হোসেনের (রাঃ) হত্যার বিচার হয়নি। সিরাজুদৌলার হত্যার বিচার হয়নি। কিন্তু ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করেনি। এজিদ কিংবা মীরজাফর, সীমার কিংবা মোহাম্মদী বেগ, এদের নামে কোন সন্তানের নাম কেউ রাখে না। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীর পরিণতি এমনই হবে–হতে হবেই। ইতিহাসের শিক্ষাই এমন।

পুস্তকটি অন্য একজন প্রকাশক ইতোপূর্বে তড়িঘড়ি করে প্রকাশ করায় ভূমিকা ছাড়াই মুদ্রিত হয়। খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই বইটির সব কাজ নিঃশেষিত হলেও দ্বিতীয়বার মুদ্রণ বিলম্বিত হয়। বন্ধুবর গবেষক গ্রন্থগারিক লেখক মোহাম্মদ সা'দাত আলীর প্রচেষ্টায় আহমদ পাবলিশিং হাউস-এর মেছবাহউদ্দীন আহমদ এ বছর মুদ্রণ ব্যবস্থা করায় আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে, পূর্বের সংস্করণের মত এরও বহুল পাঠকপ্রীতি কামনা করি। সবাইকে ধন্যবাদ।

১০ জানু-১৯৯৬

মেজর মোঃ মোখলেছুর রহমান (অবঃ)

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড

ভোরের জল্লাদ যজ্ঞ :

সকাল পাঁচটা। রিভিল প্যারেড—নবদিনের সূচনা। সামরিক কর্তব্য পালন সৈন্যদের মহান দায়িত্ব। বিউগলার মিষ্টি সুরে দিনের বারতা ঘোষণা দিচ্ছেন, দলীয় অধিনায়ক রাষ্ট্রপতি ভবনে নিজ হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াচ্ছেন। ফজরের নামাজ শেষে পাঞ্জাবী খুলে রেখে তিনতলার জানালা দিয়ে সে দৃশ্য অবলোকন করছেন মহান রাষ্ট্রপতি। পাশে দণ্ডায়মান স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা। নিত্য দিনের ঘটনা।

গুড়ুম! গুড়ুম!

বিউগলার লুটিয়ে পড়লেন, পতাকা হাতেই লুটিয়ে পড়লেন কমাণ্ডার।

হ্যাণ্ডস আপ!

চারিদিক থেকে বেপরোয়াভাবে গুলি করতে করতে জল্লাদ বাহিনী ৩২ নম্বর রোডের ঐতিহাসিক বাড়িতে প্রবেশ করে।

কারা যেন গুলি করছে, বঙ্গজননী আর্তনাদ করে ওঠেন।

সর্বনাশ হয়েছে। আর্মিরা বাড়ি আক্রমণ করেছে, রাষ্ট্রপতি দ্রুত ফোনের নিকটে গেলেন। ফোন ওঠালেন। প্রথমেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ি। কিন্তু ফোন এনগেজড। তারপর তাজউদ্দিনের বাড়ি—জীবনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু। না তার ফোন অচল। ফোন করলেন জামিলকে। তিনিও কেবলমাত্র নামাজ শেষ করেছেন।

স্যার।

জামিল, আর্মিরা আমার বাড়ি আক্রমণ করেছে। আমি কাকেও ফোনে পাচ্ছি না।

স্যার, আমি এখনই আসছি।

গোলাগুলির আওয়াজ আর আর্তনাদে ততক্ষণে বাড়ির সবাই জেগে উঠেছে। দৌড়া-দৌড়ি ছুটাছুটি করছে। প্রাণভয়ে সবাই অস্থির! প্রহরীরা প্রাণপণে জল্লাদদের সঙ্গে লড়াই করছে। আর্মি-পুলিশ সবাই। ওরা প্রাণ দিবে কিন্তু দস্যুদের নিকট মান দিবে না। ভারী অস্ত্রের মুখে তারা টিকতে পারে না, তবু লড়াই চালিয়ে যায়। একে একে ঢলে পড়ে অনেকগুলি তরতাজা কর্তব্যপরায়ণ বাংলার সবুজপ্রাণ। প্রাণ হারালো জল্লাদবাহিনীর শামসুল ইসলাম, আহত হলো কয়েকজন।

তারপর তল্লাশী চালান হলো নিচ তলার আনাচে-কানাচে। যে-ই প্রতিরোধের চেষ্টা করলো সঙ্গে সঙ্গে তাকেই গুলি করা হলো। কুকুর-বিড়াল, সবাইকে। এ যেন নির্মম কারবালা হত্যাকাণ্ড!

রাষ্ট্রপতি ফোনে কাকেও পান না—নামাজের সময়। হয়তো তারা নামাজ পড়ছেন। ওদিকে গোলাগুলির আওয়াজ বাড়তেই থাকে।

তারা কি চায়—আমাকে দেখতে দাও। ঘর থেকে বের হলেন রাষ্ট্রপতি। সিঁড়ি দিয়ে নামবেন নিচে জল্লাদ মহিউদ্দিন পিস্তল হাতে দণ্ডায়মান। তার পাশে জল্লাদ বজলুল হুদা।

রাষ্ট্রপতি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোমরা কি চাও, কি জন্য এসেছ।[১]

তারা স্যালিউট করলেন। দেখামাত্র গুলি করার কথা ভুলে গেলেন। জল্লাদদের হাত কাঁপল। মেজর মহিউদ্দিনের পিস্তল মাটিতে পড়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, স্যার আপনাকে নিতে এসেছি।[২]

রাষ্ট্রপতি শান্তভাবে বললেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে কৌতুক করছো?

না স্যার। চোখ লাল করে কর্কশ কণ্ঠে এবার মেজর বজলু বলেন, আপনাকে নিতেই এসেছি।

এ সময়ে নিচ থেকে কে যেন চিৎকার করে বলে ওঠে, জল্লাদরা সবাইকে মেরে ফেলছে।

সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম। গুড়ুম। নিচ থেকে আর্তনাদ ভেসে আসে রাষ্ট্রপতির কানে। তিনি মেজর মহিউদ্দিনের দিকে চাইলেন। দু'দিন আগে এই মেজর মহিউদ্দিন জেনারেল জিয়ার একটি বার্তা রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে গিয়েছিল। তিনি এবার মাথা নত করেই বললেন, বুঝতেই পারছেন স্যার, অবস্থা ভাল না। দয়া করে আমাদের সঙ্গে চলুন।

: কোথায় যাব?

: বঙ্গভবন। না না, ক্যান্টনমেন্টে, মেজর বজলুল হুদা জবাব দেয়।

: সেখানে গিয়ে কি হবে, তার চেয়ে তোমরা আমাকে মেরে ফেল।

: স্যার সময় নষ্ট করবেন না, হুদা রাগান্বিত স্বরে বলে।

: তোমাদের কথায় আমি যেতে পারি না।

: আপনি যদি না যান তবে পদত্যাগ করতে হবে, মেজর মহিউদ্দিন বললেন।

পদত্যাগ করবো, বেশ। রাষ্ট্রপতি চিন্তিত মুখে বললেন।

যে দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেনাবাহিনীর আইন শৃংখলা ও সংবিধান লঙন করে, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বাড়িতে গোলাগুলিতে আক্রমণ করতে পারে—আমি সে দেশের রাষ্ট্রপতি থাকতে চাই না। তবে তোমাদের মতো অধস্তন কর্মকর্তাদের নিকট আমি পদত্যাগ পেশ করতে পারি না।

সেনাবাহিনীর চীফ ও ডেপুটি চীফদেরকে এখানে নিয়ে এলে আমি তাদের নিকট আমার পদত্যাগপত্র প্রদান করবো।

মেজর বজলু বললেন, তাহলে আপনাকে টাকা বেতারে যেতে হবে এবং বেতারে আপনাকে পদত্যাগ ঘোষণা করতে হবে।

একটু ইতস্তত করে তখন বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি বেতারকেন্দ্রে যেতে সম্মত আছি, তবে শেখ কামালকে আমার সঙ্গে যেতে দিতে হবে।

: তবে চলুন স্যার। মেজর বজলু ষ্টেনগান তার বুকে তাক করে বললেন।

: চলো, তবে কোনো সিনিয়র অফিসারকে সেখানে আসতে হবে।

: আমরা একজন সিনিয়র অফিসারের নির্দেশেই এসেছি স্যার।

: হু ইজ দ্যাট।

: জেনারেল জিয়া স্যার। আপনি কথা বলে দেখতে পারেন স্যার।

: তাহলে দাঁড়াও।

রাষ্ট্রপতি আবার উপরে যান। ফোন ওঠান। উপ-সেনা প্রধানের বাসায় ফোন করলেন। কেউ ধরলো না।

ডি জি এফ আই প্রধানের বাসায় ফোন করলেন, কেহ ধরল না। রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে ফোন করলেন, কে একজন অফিসার জানালেন যে, ট্যাংক দিয়ে তাদের ঘেরাও করে রাখা হয়েছে।

এমন সময় তার রাজনৈতিক উপদেষ্টা তোফায়েল আহমদ ফোন করলেন। রাষ্ট্রপতি বললেন, আমার বাড়ি আক্রান্ত। গোলাগুলি করছে, নিচে অনেককে হত্যা করেছে। যা পারিস কর।

এসময় তিনি সেনাপ্রধানের ফোন পেলেন। তাঁকে বললেন, সফিউল্লাহ তোমার ফোর্স আমার বাড়ি এ্যাটাক করেছে। কামালকে বোধ হয় মেরেই ফেলেছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও।

সেনাপ্রধান বললেন, আই অ্যাম ডুইং সামথিং, ক্যান ইউ গেট আউট দি হাউস?[৪]

রাষ্ট্রপতি কিশোরগঞ্জের ধসুদল গ্রামের ১২—১৩ বছরের ছেলে আবুল কালাম ভূইয়ার নিকট থেকে পাঞ্জাবী নিয়ে গায়ে দেন এবং তার প্রিয় পাইপটি নিয়ে ব্যালকনীতে দাঁড়ালেন। মেজর ফারুক তখন রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে ট্যাংক মোতায়েন করে বঙ্গবন্ধু ভবনের গেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছে। মেজর রশীদও তার মিশন শেষ করে সেখানে উপস্থিত তার দলবলসহ।

এসময়ে তিনতলা থেকে নেমে শেখ কামাল দৌড়ে নিচে যেতে থাকে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে আর্টিলারী নায়েব সুবেদার আবুল বাশার, নায়েব

রিসালদার সারোয়ার হোসেন, দফাদার নুরুজ্জামান ও আরো কয়েকজন। শেখ কামালের সঙ্গে আরো গুলি লাগে পি এ রহমানের গায়ে।

ওদিকে মেজর বজলুল হুদা, মেজর নূরু এক একটি ঘরে লোক খুঁজে দেখছে। মেজর মহিউদ্দিন আবার বললেন, স্যার আপনি নেমে আসুন।

মেজর ফারুক সিঁড়ির নিকট যেতেই দেখেন বঙ্গবন্ধু সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। এবার গর্জে উঠলেন, কি চাও ফারুক। তোমরা আমাকে খুন করতে এসেছ? ভুলে যাও, পাক আর্মিরা এটা পারে নি। তোমরা কি মনে করো তোমরা পারবে?[১]

ফারুক অস্ত্র নামিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, আপনি নেমে আসুন স্যার।

রাষ্ট্রপতি বললেন, তোরা আমাকে জাতির পিতা বানিয়েছিস, আজ আবার আমাকে মারতে এসেছিস।[২]

মেজর মহিউদ্দীনের মতো মেজর ফারুকও কাঁপতে থাকেন। মনে হচ্ছিল তার হাত থেকে পিস্তল পড়ে যাবে।

ফারুক আবার বললেন, আপনি নেমে আসুন স্যার।

রাষ্ট্রপতি বললেন, তোদের কথায় আমি যাব? তোরা কি ভেবেছিস? এভাবে আমার দেশকে আমি ধ্বংস হতে দিব না। আমি ক্ষমতা চাই না। আর্মিরা যদি দেশ চালাতে পারে ক্ষমতা নিয়ে নিক। জেনারেলরা কোথায়?

মেজর মহিউদ্দিন বললেন, তারাই আমাদের পাঠিয়েছেন।

তারা কে? রাষ্ট্রপতি ধমক দিলেন, তারা আসতে পারলো না।

আপনি গেলেই দেখতে পাবেন স্যার। জেনারেল জিয়া আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মেজর মহিউদ্দিন থেমে গেলেন। গলা যেন তার বন্ধ হয়ে আসছে। তাদের মিশন যেন ব্যর্থ হতে চলেছে।

এমন সময় একটা গাড়ি থামার শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলি। একটি গুলি এসে শেখ নাসের-এর হাতে লাগল। বেগম মুজিব আবার আর্তনাদ করে উঠলেন। শাড়ি ছিঁড়ে তার হাত বেঁধে দিলেন। সিঁড়ি থেকে রাষ্ট্রপতি তার সব কিছু দেখতে পেলেন এবং স্ত্রীর কন্ঠ শুনতে পেলেন।

মেজর ফারুকের পাশে এসে দাঁড়ান মেজর শরিফুল হক। তিনি চিৎকার করে বললেন: এতো দেরী হচ্ছে কেন?

মেজর ফারুক অসহায়ভাবে তার প্রতি তাকান। শরিফুল বললো, বঙ্গবন্ধু যদি আর ৫ মিনিট জীবিত থাকেন, তাহলে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এখনই তাকে শেষ করে ফেল।

তার বলার সঙ্গে সঙ্গে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, নায়েব রিসালদার সারোয়ার হোসেন ষ্টেনগানের ৬৪ টি গুলি করেন।

ইয়া আল্লাহ, বাংলাদেশকে রক্ষা করো বলেই রাষ্ট্রপতি পড়ে গেলেন। বিশাল দেহখানি তাঁর সিঁড়ির উপর পড়ে রইল তার মাথা পড়ল নিচের দিকে।[৩]

সময় তখন সকাল ৫টা ৪০ মিনিট। বাঙ্গালি জাতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রচণ্ড ভালবাসার চিরতরে অবসান ঘটল।[৬]

ফারুক মিনিটখানেক দাঁড়ালেন। তারপর অপারেশন কক্ষে উৎকন্ঠিত ভাবে অপেক্ষমান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বললেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা বেতারে যাচ্ছি।[২]

ফোন রেখে ঘর থেকে বের হতেই মেজর রশীদ ফোনে তার আংকেল মোশতাককে বললেন, মুজিবসহ সবাইকে খুন করা হয়েছে। আমি আসছি।[২]

আর ওদিকে দরজা খোলাই ছিল। মেজর মহিউদ্দিন, মেজর হুদা, মেজর নূর কতিপয় জল্লাদ নিয়ে উপরে উঠে মেইন সুইচ অফ করে দিয়ে চালাতে থাকে নৃশংস হত্যাকাণ্ড।[৪]

দরজায় দাঁড়ান অবস্থায় বেগম মুজিবকে নায়েব রিসালদার সারোয়ার হোসেন গুলি করে। দুই পুত্রবধূকে একই কামড়ায় গুলি করে দফাদার নুরুজ্জামান (কুমিল্লা)। বড় বউ রাজিয়া সুলতানার হাঁটুতে গুলি লেগেছিল। সে দিনের নটা পর্যন্ত জীবিত ছিলো। সে অনেক মিনতি করেছিল যে আমাকে আপনারা চিকিৎসা করান, আমি বেঁচে যাব এবং আমি সারা জীবন আপনাদের নার্স হিসাবে চাকুরি নিয়ে সেবা করবো। আমার গর্ভে ৫ মাসের বাচ্চা। আমাকে আপনারা বাঁচান। কিন্তু নটার সময় বেঙ্গলের এক হাবিলদার তার পেটে গুলি করে।[২]

রাষ্ট্রপতির ছোট ছেলে রাসেল (৮) মায়ের হাত ধরে ভয়ে কাঁপছিল। জল্লাদেরা তার মাকে হত্যা করলে রাসেল বলে, আমিতো পৃথিবীর কারো কাছে অন্যায় করি নি। তার কথায় সুলতানা বলে, তুমি কাদের কাছে ফরিয়াদ করছো। আমাদের কাছে এসো, রাসেল দৌড়ে দুই ভাবীর নিকট যায়।[২]

কামাল, বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিবকে হত্যার পরও সুলতানার ধারণা ছিল জল্লাদেরা তাদের মারবে না। তাই রাসেলকে তাদের কাছে যেতে বলেছিল। কিন্তু জল্লাদদের পরিকল্পনা ছিল বঙ্গবন্ধুর বংশের কাকেও বাঁচিয়ে রাখবে না। দুই বৌকে আলাদা করে গুলি করে হত্যা করে। রাসেল এক ফাঁকে দৌড়ে নিচে সারিবদ্ধ দাঁড় করানো বাড়ির কাজের লোকদের নিকট আশ্রয় নেয়। দীর্ঘকাল যাবত দেখাশুনার ছেলে রমার কাছ থেকে রাসেলকে ছিনিয়ে নেয়। রাসেল ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, আল্লাহর দোহাই আমাকে জানে মারবেন না। বড় হয়ে আমি আপনাদের বাসায় কাজের ছেলে হিসাবে থাকবো। আমার হাসু আপা, দুলাভাই এর সঙ্গে জার্মানীতে আছে। আমি আপনাদের পায়ে পড়ি, দয়া করে আপনারা আমাকে জার্মানীতে হাসু আপা

ও দুলাভাই এর কাছে পাঠিয়ে দিন। "তখন উক্ত সৈন্যটি রাসেলকে বাড়ির গেটস্থ সেন্ট্রির কাছে লুকিয়ে রাখে। এর প্রায় আধ ঘন্টা পর একজন মেজর সেখানে রাসেলকে দেখতে পেয়ে তাকে দোতালায় নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ১৮টি গুলি করে হত্যা করে।[৩]

একজন পুলিশ অফিসার মাসুম বাচ্চা বলে রাসেলের জীবন ভিক্ষা চান। ঐ অফিসারকে সাথে সাথে হত্যা করা হয়। এ সময় গুলিতে রাসেলের একটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখনো সে আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না, বলে চিৎকার করছিল।[৪] শিশু রাসেলের সে চিৎকার আল্লাহর আরস কেঁপে উঠলেও জল্লাদদের মনে কোনো করুণার উদ্রেক হয় নি।

সব চাইতে নৃসংশভাবে হত্যা করা হয়েছিল শেখ মনির স্ত্রীকে। কারণ তার গুলিতে আর্টিলারীর একটা ছেলে মারা গিয়েছিল। তাই তার স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে থ্রি ও ব্রোনিং মেসিন গানের ব্যারেল ঢুকিয়ে ৫/৬ জনে ধরে কম পক্ষে ৬০/৭০ রাউণ্ড গুলি করেছিল।[২]

ফারুক রশীদ চলে যাবার পর জল্লাদেরা "পুরো বাড়িটা এক এক করে তল্লাশী চালায় এবং মূল্যবান সব কিছু লুটে নেয়। প্রতিটি আলমারী, ড্রয়ার ও অন্যান্য আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলে।[৬]

বঙ্গবন্ধুর ছেলের বউ-এর মুকুট আর্টিলারীর ২ জন ভাগ করে নিয়েছিল। তখনই মেজর ফারুক তাদের গুলি করে মেরে ফেলে। কিন্তু আর্টিলারীর এস এম আনিসুর রহমান একটা ক্যাসেট নিয়ে যায় আর রিসালদার সারোয়ার বেগম মুজিবের নেকলেছ নিয়ে নেয় এবং দফাদার বদরুল নেয় বঙ্গবন্ধুর হাত ঘড়ি।[২] বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভাই শেখ নাসের প্রাণের ভয়ে বাথরুমে লুকিয়ে ছিলেন। আর্মিরা তাকে সেখানেই গুলি করে হত্যা করে।[৩]

লেঃ শেখ জামালের করুণ মৃত্যু :

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনীর। গড়লেন সশস্ত্র বাহিনী, প্রতিষ্ঠা করলেন বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী। মেঝ ছেলে শেখ জামালকে অনুপ্রাণিত করলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদান করতে। শেখ জামাল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করলেন এবং ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করলেন। আর তখন থেকেই স্বাধীনতা বিরোধীপক্ষ, বঙ্গবন্ধুর প্রতিপক্ষ প্রচার শুরু করলেন যে, কিছু দিনের মধ্যে শেখ জামাল সশস্ত্র বাহিনীর নামমাত্র প্রধান সেনাপতি হবেন আসল ক্ষমতা থাকবে ভারতের হাতে। এ নিয়ে সাধারণ সৈন্যরা বিভ্রান্ত হলেন।

১৪ই আগষ্ট রাতে পারিবারিক অনুষ্ঠান শেষ করে লেঃ জামাল বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে ইউনিটে ফিরে গেলেন। ইউনিট অনুষ্ঠান ছিল ঢাকার একটি

হোটেলে। সেখানেই একটি কামড়াতে রাত বারটায় তাঁর গলা চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে মারলেন দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গলের তদানীন্তন টু আই সি। সেখান থেকে তার লাশ বেঙ্গল ল্যান্সারের ও আর টয়লেটে রাখা হয়। মেজর ফারুক নিজের তত্ত্বাবধানে একটি এ্যামবুল্যান্সে করে সকাল বেলা বঙ্গবন্ধু ভবনে নিয়ে রাখলেন। কি নিষ্ঠুর নিয়তী কি নির্মম পরিহাস। দেশের রাষ্ট্রপতি তখনো জীবিত। রাষ্ট্র ক্ষমতা তখনো তাঁর হাতে। স্বাধীন বাংলার সবচেয়ে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিত্ব। অথচ তারই সন্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় বিনা অপরাধে নিহত হলেন। তার বিচার হলো না।

শেখ মনির বাড়ি :

মেজর রশীদ তার দল নিয়ে শেখ মনির বাড়ি যায় এবং শেখ মনি ও তার স্ত্রী বেগম শামনুন্নেসা মনিকে হত্যা করে। মনি ও বেগম মনিকে হত্যা করে দফাদার বারি (নোয়াখালিস্থ পেনশনে আছে), দফাদার মতি (বগুড়া, পেনশনে) ও দফাদার সাইদুর (বগুড়া, পেনশনে)।[২]

মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবত :

দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গলের টু আই সি (উপ-অধিনায়ক) এর দল যায় তাঁর বাড়ি এবং সেখানে হত্যা করে আবদুর রব সেরনিয়াবত, বেবী সেরনিয়াবত, আরিফ সেরনিয়াবত, বাবু সেরনিয়াবত, নান্টু এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন কর্মচারীকে। সেরনিয়াবতের বাড়িতে যারা আহত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন, বেগম রব সেরনিয়াবত, বেগম আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ, মিউটি সেরনিয়াবত, আবুল খায়ের আবদুল্লাহ, হেনা সেরনিয়াবত।[১২]

বিশ্বস্ত সৈনিক :

একদিকে মোনাফেক মীরজাফর জল্লাদদের হত্যাযজ্ঞ আর উল্লাস উন্মাদনা আর একদিকে সেনাপ্রধানের অসহায়ত্ব, সিজি এ-এসের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, ব্রিগেড কমাণ্ডারের সিদ্ধান্তহীনতা, সৈন্যদের নিষ্ক্রিয়তা, উদাসীনতা। আর এতো সবের মধ্যেও নির্ভিক নিঃস্বার্থ কর্তব্যপরায়ণ বীর জামিল, বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে শোনামাত্র সেনাপ্রধানকে ফোনে জানিয়ে তার রাষ্ট্রপতি-রক্ষার জন্য ছুটে গিয়েছিলেন ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি অভিমুখে। জল্লাদ-বাহিনীর শত নিষেধ সত্ত্বেও তার দায়িত্ব পালনে এতটুকু কার্পণ্যতা করেন নাই। কাণ্ডজ্ঞানহীন জল্লাদেরা গুলি করে তাঁর গতি চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দেয়। কিন্তু কর্ণেল জামিল নিজের প্রাণ দিয়ে তার বিশ্বস্ততার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন। ইতিহাস বঙ্গবন্ধুকে যেভাবেই মূল্যায়ন করুক

না কেন, কর্ণেল জামিলের আত্মত্যাগ তাকে বঙ্গবন্ধুর মহান জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে অমরত্ব দান করেছে।

বঙ্গবন্ধু ভবনে লাশ আর লাশ :

"দেওয়ালে বেশকিছু গুলির দাগ। নিচের তলায় রিসেপশন রুমে দু'জনের মৃতদেহ পড়েছিল। একজন শেখ কামাল আর একজন পুলিশ অফিসার"।

দ্বিতীয় তলার সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুর লাশ পড়েছিল। তাঁর পরিধানে ছিল পাঞ্জাবী এবং লুঙ্গী। তাঁর দেহ সিঁড়ির উপরে এমনভাবে পড়েছিল মনে হচ্ছিল যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হঠাৎ পা পিছলে পড়েছেন। তাঁর মুখে কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল না। চেহারা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাঁর বুকের উপর ডান হাতটা ভাঁজ করা। বুকের অংশটুকু ছিল সম্পূর্ণ রক্তাক্ত। রক্তের আবিরে দেখা যাচ্ছিল না। তবে তর্জনী আঙ্গুলটা ছিঁড়ে গিয়ে চামড়ার টুকরার সাথে ঝুলছিল। তাঁর দেহের অন্য কোনো অঙ্গে তেমন কোনো আঘাত লাগে নি।

দোতালার সিঁড়ির কাছের ঘরটাতেই বেগম মুজিবের দেহ দেউড়িতে উপুড় হয়ে পড়েছিল। তার গলার হারটা ঢুকে ছিল মুখের মধ্যে। কামরার ভিতর শেখ জামাল এবং তার নব বিবাহিতা স্ত্রী রোজী জামালের দেহ। ব্রাস অথবা গ্রেনেডের আঘাত সরাসরি তার মুখে লেগেছিল। তার পাশে মিসেস কামাল। প্রচুর রক্তক্ষরণে তার চেহারা সম্পূর্ণ বিবর্ণ শুকনো। তার কোল ঘেঁসে ছোট রাসেলের মৃতদেহ। করুণ দেখাচ্ছিল তার মুখ।[৫]

নিচের তলায় বাথরুমে শেখ নাসেরের মৃতদেহ পড়েছিল। বাড়ির পিছনের আঙ্গিনায় একটি লাল গাড়িতে পড়েছিল কর্ণেল জামিলের মৃতদেহ। বুলেট লেগেছিল ঠিক তার কপালে।

মেডিকেল কলেজের মর্গে রব সেরনিয়াবত ও শেখ মনির লাশ :

পনের আগষ্ট নিহত আবদুর রব সেরনিয়াবত, শেখ মনি ও তাঁদের পরিবার-বর্গের মৃতদেহগুলি সৈন্যরা একত্রে গাদাগাদি করে অযত্নে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে নিয়ে গিয়েছিল। পঁচে দুর্গন্ধ হয়েছিল।

দাফন ব্যবস্থা :

১৬ই অগাষ্ট, হত্যাকাণ্ডের একদিন পর রাত্রি তিনটায় বঙ্গভবন থেকে মেজর মতি ফোন করে ঢাকা সেনানিবাসের ষ্টেশন কমাণ্ডার লেঃ কর্ণেল আব্দুল হামিদকে মৃত লাশগুলি (বঙ্গবন্ধু ছাড়া) বনানী গোরস্থানে দাফনের নির্দেশ দেন। তদনুসারে কর্ণেল হামিদ ঢাকা সেনানিবাসের ডিউটি ইউনিট ১নং

সাপ্লাই ব্যাটেলিয়ানকে প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালনে নিয়োজিত করেন। তিনি একটি দলকে লাশ সংগ্রহের জন্য পাঠান আর ৩০ জনের একটি দলকে কবর খননের জন্য পাঠান। কর্ণেল হামিদ বঙ্গবন্ধু ভবনের লাশ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের লাশগুলি চিহ্নিত করেন। তিনি লাশগুলি বনানী কবর-স্থানে ১৪টি কবরে দাফন করেন ; প্রথম কবরটি বেগম মুজিবের, দ্বিতীয়টি শেখ নাসেরের, তৃতীয়টি শেখ কামালের, চতুর্থটি বেগম কামাল, পঞ্চমটি শেখ জামালের, ষষ্ঠটি বেগম জামালের এবং ৭মটি মাষ্টার রাসেলের।[৫]

বঙ্গবন্ধুর দাফন :

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর অনেক সময় তাঁর লাশ অবহেলা অযত্নে পড়েছিল। জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু আরো বিপজ্জনক হতে পারেন আশংকায় অভ্যু-খানকারীরা ঢাকায় দাফন না করে তাঁর লাশ টুঙ্গীপাড়ায় তাঁর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করার সিদ্ধান্ত নেন। তদনুসারে ঢাকার এসপি আব্দুস সালাম ওয়ারলেসে গোপালগঞ্জের এস ডিপিও মোঃ নূরুল আলমকে দাফন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং ঢাকা থেকে এগারটায় হেলিকপ্টারে লাশ যাবে বলে জানান। অতঃপর বাঁশবাড়িয়া ও টুঙ্গীপাড়া থানার সব ফোর্স সেখানে মোতায়েনপূর্বক দাফন কাজ সমাধা করেন। বেলা দেড়টা নাগাদ হেলি-কপ্টার সেখানে পৌঁছে। ৩০ জন পুলিশ, এস ডিপিও. একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, মেজর মহিউদ্দিন ও মেজর বাশার, ১০/১২ জন আত্মীয় স্বজন, মসজিদের ৩/৪ জন মুসল্লী. কবর খননের লোক ও গোছলের লোক জানাজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেজরদ্বয় বাকি লোকদের সামিল হতে দেয় নি। জোর করে তৃতীয় কাতারে সামিল হন ম্যাজিষ্ট্রেট আব্দুল কাদের ও সার্কেল ইন্সপেক্টর আব্দুর রহমান। জানাজা শেষ হলে বঙ্গবন্ধুর দূর সম্পর্কীয় এক চাচাকে লাশ হস্তান্তর করা হয়।

বাড়ির মধ্যে থেকে একজন মহিলা চিৎকার করে মুখ দেখতে চাইলে দেখান হয়। বেলা আড়াইটায় বঙ্গবন্ধুর দাফন কাজ শেষ হয়।[১৩]

যাঁকে কেন্দ্র করেই আধুনিক ঢাকার উত্থান, ঢাকার মাটিতে তাঁরই দাফ-নের ঠাঁই হলো না। বাঙালির এও এক করুণ আর্তনাদ। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বঙ্গবীর ওসমানী বলেন, ফরাসীরা একশত বছর পরে নেপোলিয়ানের লাশ প্যারিসে পুনঃস্থাপন করেছেন। বাঙালিরা একদিন বঙ্গবন্ধুর কবর ঢাকায় পুনঃস্থাপন করবে। তাঁর কবর বাঙালির শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে পরিণত হবে। তারা মীরজাফরের মত ডার্ক হর্সের কবর গুড়িয়ে দিবে।

কমাণ্ডারদের ব্যর্থতার বীভৎস্য দৃশ্য

অসহায় সেনাপ্রধান :

সেদিন ভোর রাতে সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ অঘোরে ঘুমিয়েছিলেন। খুব সকালে সামরিক গোয়েন্দা পরিদপ্তরের পরিচালক লেঃ কর্ণেল সালাহউদ্দিন এসে তাকে খবর দেন। স্যার আপনি কি আর্মড এবং আর্টিলারী রেজিমেন্টকে শহরে পাঠিয়েছেন? তারা শহরে যাচ্ছে। তারা রেডিও অফিস দখল করেছে। তারা গণভবন ও ধানমণ্ডির দিকে যাচ্ছে।

এ কথাগুলো শুনতে শুনতে তার মধ্যে বিদ্যুতের মতো প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঢাকার ব্রিগেড কমাণ্ডার জানেন? তারপর তিনি তাকে বলেন, যদি তারা এগিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তুমি তাড়াতাড়ি ব্রিগেড কমাণ্ডার সাফায়াত জামিলের কাছে যাও। ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ানকে প্রস্তুত করে প্রতিরোধ করতে বলো। এই বলে তিনি ফোন করলেন সাফায়াত জামিলকে।

: তুমি কি জান কি হচ্ছে?

: কি ব্যাপার স্যার, সাফায়াত অবাক হয়ে জানতে চান।

: আর্মড এবং আর্টিলারী নাকি মুভ করছে।

: আমি জানি না স্যার।

: তুমি যখন জানো না তখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে বন্ধ কর। ফাস্ট, সেকেণ্ড এবং ফোর্থ বেঙ্গলকে যাওয়ার জন্য বলো।

তারপর সফিউল্লাহ বঙ্গবন্ধুকে ফোন করলেন। উনার ফোন এনগেজড ছিল। এ সময়ে তিনি নেভির চীফ এম এইচ খান এবং বিমান বাহিনী চীফ এ কে খোন্দকারের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। উনারা এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে জানান। তারপর তিনি জেনারেল জিয়ার সঙ্গে কথা বলেন।

সি জি এস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি জানালেন এ ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। সি জি এসকে তার বাসায় আসার জন্য বললেন। তিনি আবার ব্রিগেড কমাণ্ডার কর্ণেল সাফায়াত জামিলকে ফোন করেন। কিন্তু জবাব পাননি। তখন তিনি একচেঞ্জকে ধরে দিতে বললেন। এরপর ডিজিএফআই (নব নিযুক্ত) এরিয়ার কমাণ্ডার এবং প্রাক্তন ডিজিএফআই ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার রউফকে ফোন করলেন। তার বাসায় কেউ ফোন ধরে নাই, তারপর তিনি কর্ণেল জামিলকে (নতুন ডিজিএফআই) ফোন করেন। তাকে পেলেন। তিনি জানালেন যে বঙ্গবন্ধু

তাকে ডেকেছেন। তিনি তার বাসায় যাচ্ছেন। সফিউল্লাহ তাকে বললেন যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন কিন্তু তাকে পান নাই। তিনি যেহেতু বঙ্গবন্ধুর কাছে যাচ্ছেন, তাকে বলো, তিনি কিছু করার চেষ্টা করছেন। আর যদি পার, তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাও।

এভাবে কয়েক মিনিট পার হয়ে যায়। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর লাইন পান। তার সঙ্গে কথা বলেন। কথা অসমাপ্ত থাকে।[৪/৮]

এই সময়ের মধ্যে জেনারেল জিয়া ও ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ চীফের বাসা সেনা ভবনে আসেন।

সফিউল্লাহ তাদের বললেন, সাফায়াত কি করছে? বুঝতে পারছেন না। বাসায় বসে কিছু করা যাচ্ছে না তাই অফিসে যাবেন।

অফিসে যাবার জন্য তারাও চলে গেলেন।

সফিউল্লাহ কাপড় বদলের জন্য বাড়ির ভিতরে যান। এ সময় ডিজিএফআই ব্রিগেডিয়ার রউফ পিছনের দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ করেন। তিনি তখন লুঙ্গী গেঞ্জী পরা অবস্থায় ছিলেন। সফিউল্লাহ তাকে বাসায় গিয়ে কাপড় পরে আসতে বলেন। জেনারেল জিয়াও তার পর পরই চীফের অফিসে পৌঁছেন। ইতিমধ্যে খালেদও চীফের অফিসে আসেন। সফিউল্লাহ খালেদকে শাফায়াতের ব্রিগেডে যেতে বলেন এবং কেন ওরা কিছু করছে না সেটা জানাতে বলেন। কোনো তৎপরতা নেই কেন, ইতিমধ্যে তো দ্রুত তৎপরতা শুরু হওয়া উচিত ছিল।

তারপর তিনি এডিসিকে খবর নিয়ে তাকে জানাতে বলেন। এ সময়ে তিনি ঢাকার বাইরে অন্যান্য ব্রিগেড কমাণ্ডারদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। ইতিমধ্যে তারা রেডিও থেকে খবর জেনে গেছেন। তাদের তিনি জানালেন যে, যা ঘটেছে, সেটা তার অজ্ঞাতে। তিনি ঢাকার কমাণ্ডারকে প্রতিরোধের জন) নির্দেশ দিয়েছেন। পরবর্তী নির্দেশের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে বলেন।

: এ সময় খালেদ মোশাররফ-এর ফোন এলো, কি হচ্ছে খালেদ?

: স্যার ওরা আপনাকে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে চায়। ওরা কে?

: আমাকে সব বলতে দিচ্ছে না।

: যা হোক তুমি চলে এসো।

: আমাকে পনের মিনিটের জন্য আসতে দিচ্ছে।

: চলে এসো।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এডিসি এসে বলে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। এই কথা শুনার পর তার মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হল। সে খবরটি তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি।

এডিসি চলে যাবার পর পরই খালেদ ফিরে আসেন। তিনি উত্তেজিত কিন্তু হতাশাগ্রস্ত। এ সময় জিয়া এবং মিলিটারী সেক্রেটারী লেঃ কর্ণেল (এখন লেঃ জেনারেল) এ এস এম নাসিম চীফের পাশে ছিলেন।

: স্যার, আমার মিশন ব্যর্থ হয়েছে। ওদের বাঁধা দেবার জন্য চার বেঙ্গল নিয়ে শহরে গিয়েছিলাম। শহরের গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানে ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে সাধারণ অস্ত্র দিয়ে মোকাবেলা করা সম্ভব নয় বলে ফিরে এলাম।[৫]

মুক্তিযুদ্ধের হ্রাস সৃষ্টিকারী কমাণ্ডার দুধর্ষ বীর—একাত্তরের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা খালেদ মোশাররফ বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবরে দারুণভাবে মর্মাহত, শোকাহত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কে যেন তার সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছে। এক মুহূর্তে ক্লান্ত—অসহায় এবং নিশ্চল নিথর। চলৎশক্তিহীন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, একেবারে ভেঙ্গে পড়া পরাজিত বীর। অতি কষ্টে বললেন, স্যার বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। পুরো গ্যারিসন মনে করছে আপনার নির্দেশে ক্যু হয়েছে। ওরা আনন্দ করছে। কেউ নড়ছে না।[৮]

ঠিক এমন সময়েই চীফের অফিসের সামনে পর পর দুটি গাড়ি বিকট আওয়াজ করে থামে। বাইরে কিছু হৈ চৈ-এর শব্দ শোনা গেল। তারপরই সজোরে ধাক্কা দিয়ে দরোজা খুলে ষ্টেন গান নিয়ে মেজর ডালিম ও মেজর রশীদ তাদের সাথে প্রায় দশ/বার জন সশস্ত্র সৈনিক চীফের অফিস ঘরে ঢোকে। সেনাপ্রধানের দিকে অস্ত্র তাক করে চীফ কোথায় চীফ কোথায় বলে চিৎকার করতে থাকে মেজর ডালিম। তখন কর্ণেল নাসিম উচ্চ কন্ঠে বলে ওঠেন, দেখছো না চীফ সামনেই।

ডালিমের এই ঔদ্ধত্যপনা দেখে সেনাপ্রধান প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, বলেন তুমি অস্ত্র আমার দিকে তাক করছো, আদৌ সেটা যদি ব্যবহার করতে চাও করো। আর যদি কথা বলতে এসে থাকো, তাহলে অস্ত্র বাইরে রেখে এসো। এই কথার পর ডালিম অস্ত্র নামিয়ে বলে, স্যার প্রেসিডেন্ট আপনাকে রেডিও ষ্টেশনে যেতে বলেছেন।

চীফ বললেন, আমি জানি প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছেন। তখন ডালিম বলে, আপনার জানা উচিৎ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ এখন রাষ্ট্রপ্রধান।

: খোন্দকার মোশতাক তোমার রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে, কিন্তু আমার নয়।

এ কথা বলার পর ডালিম ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, স্যার আমাকে এমন কিছু করতে বাধ্য করবেন না যেটা আমি করতে চাই না।

চীফ বললেন, তুমি যা ইচ্ছে করতে পার।

ডালিমের সার্টের বোতাম খোলা ছিল। বুকের উপর হাত রেখে বলে,

স্যার, রক্ষীবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারে এটা বন্ধ করার-জন্য আপনাকে সাভারে যেতে হবে।

সেনাপ্রধান কোনো জবাব দিলেন না। এমন সময়ে মেজর আমিন আহমেদ চৌধুরী একটা রেডিও নিয়ে আসেন। তখন বেতারে ঘোষণা করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার কথা। কিছুক্ষণ পর গোয়েন্দা সংস্থার কর্মরত মেজর মাহমুদুল হাসান ফোনে নিশ্চিতভাবেই জানান যে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয়েছে।[৩/১০]

ডালিম বললেন, তাহলে রেডিও ষ্টেশনে চলুন স্যার। একটু ক্ষীপ্ত কন্ঠে সেনাপ্রধান বললেন, ডালিম আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাচ্ছি না। আমি আমার সৈন্যদের কাছে যাচ্ছি। একথা বলে তিনি এডিসিকে গাড়ি আনতে বলে উঠে দাঁড়ান এবং গাড়িতে উঠে সরাসরি ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডে যান। অবশ্য যাবার সময় তাকে মেজর রশীদ ও মেজর ডালিম গার্ড করে নিয়ে যান।[৫]

তখন সকাল হলের সেনানিবাস সেদিন কেমন থমথমে। রাস্তাঘাট একদম নির্জন। সেনাসদর থেকে ব্রিগেড অফিস কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। দুই একটা সামরিক যান শুধু চলছে। কি এক অজানা আশঙ্কায় সেনাপ্রধানের বুকটা দুরুদুরু করতে থাকে। সবাই যেন অপরিচিত। অফিসারদের মুখ কেমন মলিন শুষ্ক দেখাচ্ছে।

ব্রিগেড কমাণ্ডার সেনা উপ-প্রধানের পরামর্শ নিতে গেছেন, একজন অফিসার সেনা প্রধানকে স্বাগত জানালেন। সেনাপ্রধান দেখলেন, সৈন্যরা সবাই আনন্দ করছে। এমন কি সেখানে বঙ্গবন্ধুর কিছু ছবিও ভাঙা হয়েছে। এসব দেখে তার মুক বধির হবার অবস্থা। এমতাবস্থায় কয়েকজন অফিসার তাকে পথ নির্দেশ করে প্রথম ইষ্ট বেঙ্গল অফিসে নিয়ে যান। সেখানে ৪৬ ব্রিগেড মেজর হাফিজকে বসা দেখলেন। অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মতিয়ুর রহমান শুষ্ক হেসে সেনাপ্রধানকে তার চেয়ারে বসালেন এবং নিজেও তার উত্তর পাশে বসলেন। পূর্ব দিকে জল্লাদবাহিনীর অন্যতম ঘাতক ক্যাপ্টেন শাহাদাত দাঁড়িয়ে-দরজা বরাবর অপর ঘাতক মেজর রশীদ, তারা সবাই অস্ত্রে সজ্জিত, যেন তারা যুদ্ধ ময়দানে রয়েছে, সবাই কতকটা যেন উদ্ভান্ত বিশৃংখল, বিমর্ষ বিধ্বস্ত, অথচ তাদের কেন যেন একটু গর্ব গর্ব ভাব। ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডারের চোখ ছল ছল করছে। স্বাধীন বাংলার প্রথম সেনা—নায়ককে অভদ্রভাবে, একজন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীর মতো চেয়ারে বসানো হলো। তখনো তিনি জানেন না, দেশের মধ্যে ঠিক কি কি ঘটেছে। কি সর্বনাশ হয়েছে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের। তারই অধ্বস্তনেরা গণতন্ত্রকে গলা টিপে মেরেছে, বাংলাদেশকে পাকিস্তান ষ্টাইলে ধ্বংসের দিকে ঠেলে

দিয়েছে। জাতির জনকের রক্তে পদ্মা যমুনা মেঘনার জলরাশি রক্তিম হয়েছে, সাগরের বুকে কালিমা লেগেছে। শঙ্কিত কিন্তু ক্ষুব্ধভাবে তাই তিনি বললেন—

: এ অবস্থায় আমাকে কি করতে এখানে আনলে?

: আমাদের কিছু কথা আপনাকে শুনতে হবে স্যার?

: তোমাদের কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, তোমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পার।

: অধিনায়ক একজন বীরপ্রতীক। ভগ্ন কণ্ঠে বললেন. বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে।

: হোয়াট?

: বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে।

: আমি শুনতে চাই না...

এই বলে তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন, ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সমস্ত ঘরটা থম থমে হয়ে গেল। কেউ কেউ সাময়িক ভাবে বিচলিত হলেন। এমন কি পদোন্নতি এবং ক্ষমতা লোভের আশায় চিক চিক করা চোখগুলিও তাদের ভারাক্রান্ত হলো। অধিনায়ক ব্যাথাতুর কন্ঠে বললেন, তাঁকে মারার কথা ছিল না, ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে। ওরা বলছে।

: ওহ! ওহ! ভাবতে পারছি না।

যে লোকটি সারাজীবন আমাদের জন্য এতো কিছু করলেন, যার জন্য আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করলাম, যে লোকটি প্রতিটি মুহূর্ত শুধু আমাদের জন্য ভাবতেন, যার ভাবনা শুধু এই হতভাগ্য দেশটার জন্য তাকে তোমরা মারলে?

এ সময়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর বাংলা ও বাঙ্গালির-গৌরব; তাকে অভিবাদন করলেন, একেবারে কাছে গেলেন, প্রধান সেনাপতির মাথায় হাত রেখে বাষ্প রুদ্ধকন্ঠে বললেন, "সব শেষ স্যার।"

প্রধান সেনাপতি মাথা টেবিলে রেখেই বললেন, এমন সর্বনাশটা তোমরা কেন করলে, তিনি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করেন নি?

: আমি এসব জানতাম না স্যার।

রুদ্ধ কন্ঠে প্রধান সেনাপতি বললেন, তোমরা কি সর্বনাশ করেছো, বলতে পার? তার চেয়ে তোমরা আমাকে মারলে না কেন?

: আমাকে বলা হয় নাই, আমি জানতাম না স্যার ...।

: তুমি জানতে না তবে ট্যাংক মুভ করলো কিভাবে?

: সমস্ত ইন্ট নেট ওদের হাতে কাজ করেছে? গোখরাটা লেপের মধ্যে থেকেই তোঁকর মেরেছে।

: বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করেও তোমরা ক্ষমতা নিতে পারতে। তিনি ত তোমাদের ক্ষমতা হ্যাণ্ড ওভার করতে চেয়েছিলেন। একবার নয়—দুই দুই বার, তবুও তোমরা তাকে কেন হত্যা করলে? ইউ অল বাষ্টার্ড.....

: স্যার আমি জানতাম না, আমাকে এসব কিছু বলা হয় নাই। আপনার মতোই আমি সমস্ত ঘটনা জানি না। আমি জানলে এ হতে দিতাম না। আমি ওদের মানি না। আমি এর প্রতিশোধ নেবো। আই উইল.....

ব্রিগেডিয়ার খালেদ ফিরে যাচ্ছিলেন। দরজার নিকট পৌঁছাতেই প্রধান সেনাপতি ডাকলেন, শোনো!

: স্যার,

: ওরা তবে কারা। কারা এ জঘন্য কাজ করেছে. হু আর দে।

: আমি জানি না। এরা (অধিনায়ককে দেখিয়ে) জানে, এরাই মেরেছে। তবে শুনেছি, ওরা অনেককে হত্যা করেছে। যারা ওদের কথা শুনছে না তাকেই হত্যা করছে। খলিল সাহেবকে ধরে রেখেছে।

: ঠিক আছে। আমাকেও মেরে ফেলতে পারে। আমি ওদের কথা শুনতে পারি না। ওদের কথা মানা যায় না। শওকত কোথায়?

: আমি কাকেও পাচ্ছি না। সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আমাকেও ওরা এখানে ধরে এনেছে।

এ সময় একটা গাড়ি আসার শব্দ হলো। গড গড করে ঢুকলেন মেজর ডালিম, গর্জে বললেন, কৈ কাগজে সই হয়েছে?

: না, উনি সই করবেন না, অধিনায়ক আস্তে বললেন।

: সই করবেন না—করবেন না।

হঠাৎ যেন মেজর ডালিম থমকে গেলেন। কেমন বিমর্ষ হয়ে গেলেন।

: বঙ্গবন্ধু তোমার কি ক্ষতি করেছিলেন তোমরা তাকে হত্যা করলে? আমার সামনে থেকে বের হয়ে যাও রাস্কেল।

: আমি তাঁকে হত্যা করতে চাই নাই, আমি তাকে হত্যা করি নি?

: তবে কে করেছে? হু ইজ হি? প্রধান সেনাপতি ধমক দিয়ে বললেন।

মেজর ডালিম হাত ইশারা করে বারান্দার দিকে তাকালেন।

ঠিক তখনই আর একটা গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল।

: উনি! কি বলছো? দম বন্ধ হবার উপক্রম প্রধান সেনাপতির।

: জি স্যার। আমাকে মাফ করবেন। এই বলেই ঘর হতে বের হলেন মেজর ডালিম।

বারান্দায় তখন ব্রিগেডিয়ার খালেদের সঙ্গে উপ-সেনাপতির কথা কাটা-কাটি হচ্ছিল। উপ-সেনাপতি বললেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যাটা একটা আকস্মিক ঘটনা এতে কারো হাত নেই?

: আকস্মিক. তবে কোল হেডে করা হয়েছে।

: ফারুকেরা এসব করে এসে আমাকে বলছে এখন সামলান আপনারা।

: তা হলে সামলান, তাই যদি হবে তবে কাগজে ওনার সই নিচ্ছে কেন? আপনাকে সি এ এস বলছে কেন?

: আমি ও ব্যাপারে জানি না।

: আপনি জানেন না, এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? ইউ ডার্ক হর্স...

: হ্যাঁ তাই! আমি ভাবছিলাম, তুমি ওদের সঙ্গে আছ।

: আমি থাকলে এ ঘটনা ঘটতে পারত না। এতো বড় সর্বনাশটা আপনারা করতে পারলেন। যে কাজ ইয়াহিয়া, ভুট্টো, আয়ুব, টিক্কা পারল না, তাই আপনারা করলেন। কার শক্তিতে করলেন, আমেরিকা না চীন না ভারত?

উপ-সেনাপতি রেগে বললেন, তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করছো?

মেজর ডালিম বারান্দায় গিয়ে বললেন, এখানে হবে না স্যার। চাবী রেখে ওখানে নিয়ে চলুন বলে সেনাপ্রধানের নিকট আবার গেলেন, বললেন: স্যার এখন আমাদের সময় কম। আপনারা যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে দেশে অনেক সমস্যা হবে।

প্রধান সেনাপতি তার প্রতি কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন। ডালিম আবার বললেন, মোশতাক এখন রাষ্ট্রপতি। তাকে মেনে নিন স্যার-দেশ বাঁচান।

তখন পৌনে সাতটা। প্রথম ইস্টবেঙ্গল অধিনায়কের অফিসে প্রায় বন্দী অবস্থায় প্রধান সেনাপতি চারিদিকে চাইলেন। পাশে অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল মতিউর রহমান, বি পি একটি কাগজ বের করে ক্যাপ্টেন শাহাদাত (এ্যাডজুট্যান্ট) নাড়া চাড়া করতে থাকে। একটু দূরে দণ্ডায়মান ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং মেজর ইকবাল (সুনামগঞ্জ বাড়ি)।

: আমি তোমাদের কোন কথা শুনতে চাই না মতি। তোমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পার। ইউ ক্যান কিল মি।

অধিনায়ক গোঁফ তা দেন, মুখে তার মলিন হাসি। এখন তারই বা কি করার আছে। তার কাছে সব কিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এমন হবে তা বিশ্বাস হয় না। অথচ ওরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। ওদের কথা না শুনলেই মেরে ফেলছে। জল্লাদ আর কি। ট্যাংক দিয়ে তার ব্যাটেলিয়ান ঘিরে ফেলেছে। এ অবস্থায় সৈনারা রাইফেল নেবারও সুযোগ পাবে না। অন্য দুই ব্যাটালিয়ানের অবস্থাও তাই। গুরু গম্ভীর ভাবে বললেন, নিজের সর্বনাশ করে লাভ কি স্যার। যা হবার তা হয়েই গেছে। বঙ্গবন্ধুকে আমরাও ভালবাসতাম। এখন ওসব ভেবে লাভ কি। আপনি ভাল মানুষ,

ভালই থাকুন। শেখ মুজিব নাকি দেশটাকে ধ্বংস করছিল, ওরা রক্ষা করেছে!

: একে রক্ষা বলে? তুমি জান না, কি সর্বনাশ ওরা করেছে। দেশটাকে আবার হাজার বছর পিছিয়ে দিল। তদুপরি স্বাধীনতা রক্ষা করাই মুশকিল হবে। নিজেদের স্বার্থে তোমরা এমন এক জন মহান নেতাকে হত্যা করলে? জঘন্য বর্বরতা, আমি—আমি ভাবতে পারছি না, এ মুহূর্তে আমার হাতে অস্ত্র থাকলে তোমাদের আমি খুন করতাম।

: সেতো আর পারবেন না স্যার, নিন কাগজটা সই করুন। বলে বাঁদরের মতো নাচতে থাকেন ক্যাপ্টেন শাহাদাত। আবার বলেন, আর দুই মিনিট সময় দিলাম, সই করলে করবেন না করলে মজা দেখবেন, বলেই তিনি দেওয়াল থেকে বঙ্গবন্ধুর ফটোটা নিজের হাতে ভেঙ্গে চুরমার করলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সেনাপতি লাফ দিয়ে উঠলেন। সেই সময় কর্ণেল মতি প্রধান সেনাপতির একটা হাত ধরে বললেন, অস্থির হবেন না স্যার। শেখকেই মেরে ফেলা হয়েছে। ফটো ভাঙ্গলে কি হবে। মেনে নিন স্যার। সবাই এখন বিশৃঙ্খলার মধ্যে।

: সবাই উন্মাদ তাই বলে কি আমিও হবো নাকি!

: আপনাকেও করা হবে। ক্যাপ্টেন শাহাদত বলেন। তেমন হলে আপনাকে মেরে আপনার মাংস কুকুরকে খাওয়ানো হবে.....

কর্ণেল মতি তাকে ধমকের সুরে বললেন, শাহাদত থাম-ত। স্যার অবুঝ হবেন না। শাহাদত বলেন, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না, চিৎকার করে—মজিদ সাব সব বকসারদের নিয়ে আসুন।

এসময় প্রধান সেনাপতি খুব রেগে গিয়েছিলেন এবং ক্যাপ্টেন শাহাদৎকে ঘুষি মারতে উদ্যত হলে উনি সরে যান।

: ইডিয়ট! দেশটা ধ্বংস করবে তোমরা?

: না আমরা দেশটাকে বাঁচিয়েছি, মেজর মাহমুদ বলেন (জেনারেল জিয়ার চাচাত ভাই)। এ সময় জেনারেল জিয়া বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। সুবেদার তাজুলও সেখানে ছিলেন, মেজর ডালিম কাছে গিয়ে জিয়ার সঙ্গে আলাপ করলেন। জোরে বললেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। আর কোনো ভয় নাই।

: ব্রিগেডিয়ার খালেদ গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাভারের অবস্থা কি?

: ঠিক করা হয়েছে।

: রক্ষীরা আসবে না তো?

ওরা আসতে পারবে না, রক্ষীদের হাতিয়ার নেওয়া হয়েছে। রাস্তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এ সময়ে ঘরের মধ্যে প্রধান সেনাপতির উপর খুব চাপ সৃষ্টি করা হয়। ক্যাপ্টেন শাহাদৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। তা দেখে ব্রিগেডিয়ার খালেদ ছুটে আসেন। ক্যাপ্টেন শাহাদৎকে থাপ্পর মারেন—ইয়া রাস্কেল, আর যদি নড়েছ কি গুলি খেয়েছ। কর্ণেল মতি বললেন, আমি খুব দুঃখিত স্যার। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। এখন অবস্থা ভাল নয় স্যার। পরে সব বুঝতে পারবেন। আমার অনুরোধ রাখেন স্যার, কাগজে সই করে দিন। প্লিজ স্যার। আমাদের মুখের দিকে চেয়ে। প্রধান সেনাপতি তার দিকে চাইলেন।

মতি!

স্যার, প্লিজ! আপনার জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। এ দৃশ্য আমি দেখতে চাই নি। এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। কিন্তু উপায় নেই। ওরা এখন মানুষ নেই স্যার। জেনারেল জিয়ার দিকে হাত ওঠালেন। কি যেন বুঝাতে চাইলেন।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন, আজ আর কোনো উপায় নেই স্যার। আপনাকে আমি বার বার বলেছিলাম। আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। প্রমাণ খুঁজলেন। এখন বাঁচামরা সমান। দিন সই করে দিন স্যার।

সিজি এস ভুল করলেন, সেনাপ্রধান ঘরের মধ্যে তাকালেন। তারপর সই করে দিলেন। জল্লাদদের নিকট থেকে বেঁচে থাকার সনদ লাভ করলেন।

সেই কাগজে কি লিখা ছিল? বিশ্বাসঘাতক মোশতাককে রাষ্ট্রপতি হিসাবে মেনে নেবার, সামরিক বাহিনী দ্বারা অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে তার স্বীকৃতি, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার স্বীকৃতি, না সেনাপ্রধানের দায়িত্ব ত্যাগের? এ প্রশ্নগুলি আমার দেশবাসীর।

এ ভাবেই তিনি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সামরিক বাহিনীর হাতে বাক্সবন্দী করে দিলেন। কারণ তিনি যদি ঐ কাগজে সই না করতেন তাকে সেজন্য মেরেও ফেলা হতো, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাকি আঠারোটি ব্যাটেলিয়ান তার রক্তের বিনিময়ে ইতিহাসের গতি ঘুরিয়ে দিত। কিন্তু তিনিই তাদের বুঝিয়ে সামরিক নেতৃত্বের নিকট পরাজিত হলেন। অথচ ঐ আঠারটি ব্যাটেলিয়ানের অধিনায়করা ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাষ্টের ঘটনার বিরুদ্ধে ছিলেন। সৈন্যরাও ছিল। তার প্রধান কারণ ছিল এ ঘটনাটি ঘটেছিল ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে মাত্র একজন উচ্চভিলাষি ক্ষমতালোভী জেনারেলের নেতৃত্বে। যার কথা তখন তিনিই সব জানতেন। মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ জন অফিসার ও একশত বিশ জন জোয়ান ছিল ঐ ডার্ক হর্সের সঙ্গে। সেদিন যদি একটি নেতৃত্ব রুখে দাঁড়াত, ইতিহাস আজ অন্য রকম হতো।

কিন্তু প্রধান সেনাপতি, তাঁর সিজি এস সে দিন সঠিক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিনা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। ঠিক যেভাবে একাত্তরের ২৫শে মার্চ তার বাহিনী শত্রুকে আঘাত না করে পিছনে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি, পঁচাত্তরে, প্রাণের মায়ায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছিলেন ১৮টি বছর। সেদিন তিনি সত্য কথাটি বলতে পারেন নাই। সব কিছু জেনেও প্রতিবাদ করেন নাই। তার অজ্ঞাতসারেই তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের হাতের পুতুল হয়েছিলেন। দেশবাসীকে এক ভয়ঙ্কর অনিশ্চিত অন্ধকারে ফেলে ছিলেন। তার বাহিনীকে এক প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। অথচ তার হাতেই ছিল স্বাধীন বাংলার নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি একটি বাঙালি ব্যাটেলিয়ানের উপ-অধিনায়ক ছিলেন। অধিনায়কও বাঙ্গালি এবং ব্যাটেলিয়ানের অধিকাংশ অফিসারও বাঙ্গালি। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর তারা দুর্গ তৈরী করতে পারেন নাই। পাকিস্তান আর্মির আক্রমণে প্রতিরোধ করতে পারেন নাই। তাদের মোকাবেলা করতে পারেন নাই। আবার মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মুহূর্তেও তিনি ঢাকার কমাণ্ডার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি ঢাকায় উপস্থিত থেকেও ঢাকাকে রক্ষা করতে পারেন নাই। তার বাহিনীর অনেক মুক্তিযোদ্ধা সদস্যরা কমাণ্ড ত্যাগ করে জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল। তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নাই। ঢাকাবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে ভারতীয় বাহিনীকে অভ্যর্থনা দিয়েছে বেশি উল্লাসে, উৎসাহে। মুক্তিরা বিশৃংখল হয়েছে। লুট করেছে। হত্যা করেছে। সেই মুহূর্তে ঢাকার অধিবাসী, মুক্তিদের চেয়ে ভারতীয় বাহিনীকে বেশি নিরাপদ মনে করেছে। এমন কি রাজাকার, শান্তিবাহিনীর সদস্যরা এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী। অধিকন্তু পাকবাহিনী কর্তৃক ফেলে যাওয়া সামরিক বেসামরিক দলিল দস্তাবেজ মুক্তিদের উশৃংখলার জন্যই রক্ষা করা যায় নাই। আর এসব তাঁর গৌরবময় জীবনকে অনেকটা ম্লান করে দিয়েছে।

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, পি এস সি এর অবিমৃষ্যকারিতা

১৪ই অগাষ্ট ১৯৭৫ রাত্রি সাড়ে নয়টা মেজর ফারুক রহমান, এ্যাকটিং কমাণ্ডিং অফিসার, বেঙ্গল ল্যান্সার, ফোন করলেন, স্যার, সবাই এসে গেছেন।

: অল রাইট, আমি আসছি।

আল্লাহর নাম নিয়ে, উপ-সেনাপ্রধান তার বাসভবন থেকে পুরানা ময়মনসিংহ রোড দিয়ে সেনাভবন এবং সেনাসদর এর সামনে দিয়ে দ্রুত বেগে বেঙ্গল ল্যান্সার এর এ্যাকটিং সি ও এর অফিসে পৌঁছলেন ৯টা ৪৫ মিনিটে। পৌঁছে তিনি এক নজর চোখ বুলিয়ে নিলেন, সবার সঙ্গে হাত মিলালেন। এ

অধিবেশনের তিনিই মধ্যমণি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ বোষ্টার একান্তে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে আলাপ করলেন।

মেজর ফারুক অদ্যকার রাতের অভিসারের পূর্ণ বর্ণনা দিলেন।

: চমৎকার মিঃ বোষ্টার, খুব আনন্দিত হলেন। নীল নকশা মোতাবেক অগ্রসর হতে সম্মতি দিলেন। আলোচনা হতে হতে রাত্রি বারটা বেজে গেল, একে একে সব মেহমান চলে গেলেন। ফারুক বললেন, স্যার আপনি এখন এখানে থাকবেন, না বাসায় যাবেন?

ডালিম বলেন, এখন বাড়ি যাওয়া ভাল। মার্চ করার সময় একবার আসলেই চলবে।

জেনারেল জিয়া মাথা নেড়ে সায় দিলেন এবং বাসায় চলে গেলেন।

আধা ঘন্টা পরে মেজর রশীদের ফোন পেলেন।

স্যার, সাঁজোয়া বাহিনী রেডী? আর চাচাকে সব অবগত করেছি। সব কিছু ঠিক আছে।

: অপারেশন রুমে কোন সৈনিক থাকবে না। তুমি যাবার আগে এটা নিশ্চিত করবে।

: ঠিক আছে স্যার। এখানে সবাই অফিসার। বোষ্টার সাহেবও আছেন।

আরো আধা ঘন্টা কাটে। মেজর ফারুক ফোন করে, স্যার আমরা মার্চ করে বিমান বন্দরে যাচ্ছি।

জেনারেল জিয়াও মেজর ফারুকের সঙ্গে বিমান বন্দরে পৌঁছলেন। তৎক্ষণে নাইট ট্রেনিং শেষ হয়েছে। গোলন্দাজ বাহিনীর ৫০ এবং সাঁজোয়া বাহিনীর ৫০ জন করে বাছাই পূর্বক ৫টা গাড়িতে করে চারটায় যাত্রা শুরু। যাত্রার পূর্বে মেজর ফারুকের বিশেষ ভাষণ। জিয়া সৈন্যদের বললেন, যেভাবে তোমাদের বলা হয়েছে তার যেন ব্যতিক্রম না হয়।[২]

পুরাতন ময়মনসিংহ রোড তখন বর্তমান জিয়া বিমান বন্দরের ভিতর দিয়ে কার্যকরী ছিল। ময়মনসিংহ রোড চালু হলেও তেমন কার্যকরী হয় নাই। বি আর টি সি বাস সহ সব রকম বাস ট্রাক পুরাতন রাস্তা দিয়েই চলাচল করছিল। জিয়া সে পথেই ফিরে গেলেন। কিন্তু বাসায় না গিয়ে ২ ফিল্ড আর্টিলারীর অপারেশন নিয়ন্ত্রণ কক্ষে গিয়ে বসলেন। নিজে সেখান থেকে অপারেশন পরিচালনা করতে লাগলেন।

৫টা ৪২ মিনিট। মেজর ফারুক তাকে জানালেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। জিয়া ২ ফিল্ড আর্টিলারী অপারেশন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে সোজা বাংলাদেশ বেতার ভবন, শাহবাগে ৬টায় পৌঁছলেন। অপারেশন কমাণ্ডাররাও সেখানে তখন পৌঁছে গেছেন। জেনারেল জিয়া ডালিমকে বঙ্গবন্ধুর হত্যার সংবাদ প্রদান করতে ইশারা

করলেন এবং বেতার ভবন থেকে সোজা সেনানিবাসে তার বাসায় পৌঁছলেন। মুখে তার বিজয়ের হাসি।

বাসায় ফোন বাজছিল, ওঠালেন, হ্যালো জিয়া বলছি।[৬] অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো ভগ্ন কণ্ঠস্বর। সফিউল্লাহ বলছি : ট্যাংক, আর্টিলারী মুভ করেছে, আপনি কিছু জানেন?

: তাই নাকি। ভাবখানা এমন যে তিনি কিছুই জানেন না।

: আপনি দ্রুত আমার বাসায় চলে আসুন।[৮]

জেনারেল জিয়া সেনাভবনে পৌঁছে দেখলেন, মুষড়েপড়া বিধ্বস্ত সেনাপ্রধান ফোনে ৪৬ ব্রিগেড কমাণ্ডারের সঙ্গে আবলতাবল বলছেন। তিনি মৃদু হাসলেন। সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেখানে পৌঁছলেন। তিন জনে আলাপ করলেন। শেষে অফিসে যাবার সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু জেনারেল জিয়া বাসায় গেলেন। সেভ করলেন, পোষাক পরিবর্তন করলেন। এ সময়ে ব্রিগেড কমাণ্ডার কর্ণেল শাফায়াত জামিল তার বাসায় আসলেন। বললেন, স্যার, প্রেসিডেন্টকে খুন করা হয়েছে। এখন আমাদের করণীয় দিক নির্দেশ করুন।[৬]

জিয়া খুব শান্ত ধীরস্থিরভাবে বললেন, প্রেসিডেন্ট খুন হয়েছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট রয়েছেন। তাদের বিষয় তাদের সামলাতে দাও আমাদের চিন্তার কিছু নেই। এটা তাদের ব্যাপার। উপ-রাষ্ট্রপতি আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন। তুমি তোমার অফিসে যাও। ইউনিটের লোকজনকে শান্ত থাকতে বলো। আমরা সেনাসদর যাচ্ছি দেখা যাক কি করা যায়।

তার কথায় কর্ণেল জামিল স্তম্ভিত হলেন। একটু আগে মেজর রশীদের সঙ্গে তার কথা হয়েছিল। তার কথার সঙ্গে কেমন যেন একটা মিল সেনা উপ-প্রধানের। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তার অফিসে ফিরে যান। তিনিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন।

ব্রিগেড কমাণ্ডারকে দ্রুত এ্যাকশনে যাওয়া থেকে বিরত করতে পেরে জিয়ার বুকখানি গর্বে ভরে গেল। তিনি পূর্ণ আস্থা নিয়ে সেনাসদর গমন করলেন। এক বার চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। অফিস টাইম শুরু না হলেও সেনাসদরে অনেক সৈনিক চলে এসেছে। অবাক বিস্ময়ে তারা দেখছে। চারিদিকে থমথমে ভাব। তিনি সেনাপ্রধানের অফিসে ঢুকলেন। তার প্রবেশের পরেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ ঢুকলেন। সম্ভাব্য কার্যব্যবস্থা নিয়ে তাঁরা আলাপ করলেন। তিনি সব সময়েই রিজার্ভ রইলেন। তেমন কোনো পরামর্শ দেন না, কথা বলেন না। একবার শুধু বললেন, আর্মি এ্যাকশনের দরকার নেই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

তাঁর কথা সেনাপ্রধানের মনপুত হলো না। তিনি খালেদকে ৪৬ ব্রিগেডে যেতে বললেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদও চলে গেলেন। সিজিএস তার কর্তব্য ভুলে নিজেই গেলেন ব্রিগেডে। অথচ নিজে না গিয়ে কাকেও পাঠাতে পারতেন। সব কিছু শুধু ওলট-পালট হতে থাকে। নির্দিষ্ট ভাবে কার্যব্যবস্থা কেউ নিতে পারে না।

খালেদ যাবার পরেই মেজর ডালিম তার দলবল সহ চীফের ঘরে ঢুকেন এবং চীফের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থাতেও জিয়া নীরব নিস্তব্ধ রইলেন। মেজর ডালিমের ঔদ্ধত্যতা দেখেও তিনি কিছু বলেন নাই। মনে হচ্ছিল তিনিই ডালিমকে দিয়ে এ কাজটি করাচ্ছেন। এ হীনমন্যতার কোনো মানে হয় না। কালো চশমার ভিতর দিয়ে ঠিক বুঝা না গেলেও তাকে কেমন যেন রহস্যজনক মনে হচ্ছে। তার পোষাক—পরিচ্ছদ কেমন পরিপাট্য যেন কিছুই হয় নাই—এমন একটা ভাব।

সেনাসদর থেকে জেনারেল সফিউল্লাহ যাবার সময় তার পিছনে বের হন জেনারেল জিয়া। তার আগে মেজর ডালিমের জিপ। জিয়া একটু এগিয়ে এসে ডালিমকে বললেন, কাম হেয়ার, ইউ হ্যান্ড ডান সাচ এ গ্রেট জব। কিস মি। কিস মি। জিয়া ডালিমকে জড়িয়ে ধরলেন, পরম উষ্ণতায় বললেন, ইউ কাম ইন মাই কার।

: নো স্যার, থাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ। মেজর ডালিম বললেন, ইউ আর মেজর জেনারেল-এণ্ড আই অ্যাম এ সিম্পল মেজর। আদার ওয়াইজ ইউ আর দা হিরো অফ এনটায়ার শো, সো প্লিজ এলাউ মি টু গো মাই জিপ।

তারা চলে গেলেন। হেড কোয়ার্টারস অফিস তখন কৌতূহলের আর ঔৎসুক্যের দৃষ্টিতে ছেয়ে গেছে।[৪] সুবেদার জেড এ খান, সুবেদার আবুল বাসার, এরা সবাই হতবাক। সেনাপ্রধানকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। আর উপ-প্রধান জল্লাদের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। তবে কি তিনি পলাশীর মতো আর একটি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। মেজর ডালিমের কথার অর্থই বা কি? এক জন বরখাস্তকৃত মেজর ইউনিফরম পড়ল কেন? এমনি হাজার প্রশ্ন সৈনিকদের মনে তোলপার করতে লাগল। কেউ বা বঙ্গবন্ধুর হত্যার জন্য ফুঁপিয়ে—ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন।

সিজি এস এর ব্যর্থতা :

সিজিএস মূলত সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা। সেনা অপারেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। বলা যেতে পারে তার অজ্ঞাতে বাংলাদেশের কোন অপারেশন হতে পারে না। নৌ, বিমান, বিডিয়ার, পুলিশ, কারো না। পনের আগষ্ট এর অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্র দীর্ঘদিনের। এরূপ একটি ষড়যন্ত্রের বিষয়ে তার জানা

উচিৎ ছিল। কিন্তু কিছুই জানতে পারেন নাই বলেছেন। আবার ঘটনার পরও বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য তেমন কোনো জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নাই। অধিকন্তু ট্যাংক ও কামানের গোলাবারুদের ব্যাপারেও তারই জানার কথা ছিল। হত্যাকাণ্ডের পরে যখন তিনি জানতে পারলেন, গোলাবারুদ ছাড়াই সেগুলি মুভ করেছে তখনও তিনি পালটা ব্যবস্থা নিতে পারতেন। কিন্তু চাপের মুখে রক্ষীবাহিনীর ভয়ে, তিনি বিদ্রোহীদের দাবীতে সেনাপ্রধানের অজ্ঞাতে গোলাবারুদ প্রদান করলেন। তখন যদি তিনি একটু কৌশল অবলম্বন করতেন এবং পদাতিক সৈন্যদের এ বার্তা দিতে পারতেন, তাহলে রাইফেলের বাট দিয়েই পিটিয়ে মারতো ওদের, কিন্তু সিজিএস ও পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। তিনি যদি সেদিন বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হতেন তবে তার সে মৃত্যু অনেক গৌরবান্বিত হতো। ব্যর্থতার গ্লানি তাকে ম্লান করতে পারত না। সেদিনের ঘটনার পর গোয়েন্দা পরিদপ্তর, অপারেশন পরিদপ্তর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল সিজিএস কিংবা সেনাপ্রধান সে সম্পর্কে কিছু করেন নাই। সেনাপ্রধান ও সিজিএস সেনাসদর ছেড়ে কেন পদাতিক ব্রিগেডে গেলেন? তবে কি তারা বুঝতে পেরেছিলেন সেনাসদর তাদের পক্ষে নেই। হত্যাকাণ্ডের পরে মেজর ফারুক টেলিফোন করে মিলিটারী অপারেশনের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক কর্নেল (এখন লেঃ জেনারেল) নূরউদ্দিনকে রক্ষী বাহিনীকে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন আনার জন্য বলেছিলেন।[৬] সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকরী করা হয়েছিল। অথচ রক্ষীবাহিনীকে পুলিশে কিংবা বিডিআর এ আত্মীকরণ করার জন্য দাবী ছিল।

বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানীর ব্যর্থতা :

সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনীর মাত্র দুটি ইউনিটের কয়েকজন অফিসার এ জাতীয় নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঢাকাসহ সারাদেশের ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা ও অফিসারেরা ক্ষুব্ধ ছিল। তাদের এ কার্যব্যবস্থার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা চাপ সৃষ্টি করলেও সিনিয়র অফিসার বিশেষ করে ব্রিগেড কমাণ্ডারেরা অভ্যুত্থানের পক্ষে থাকায় এবং সেনাসদরে সেনাপ্রধান ও পি এস ওদের ব্যর্থতার জন্য তারা কিছু করতে পারছিল না। এ সময় জেষ্ঠতম সকল অফিসারই ওসমানীর পরামর্শ চেয়েছেন। তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের চেয়ে বিষয়টি মোশতাকের নেতৃত্বে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করতঃ সরকার চালিয়ে যেতে মত দেন এবং নিজেও উক্ত সরকারের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হন। অর্থাৎ ষড়যন্ত্রকারীদের খপ্পরে পড়েন। তিনি যদি তা না করে সফিউল্লাহকে বা খালেদকে এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টকে প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্যে বলতেন তবে সত্যই

একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটতো। বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাদের পরাভূত করতো এবং দেশে জিয়ার স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারতো না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাধাগ্রস্থ হতো না এবং উত্থান হত না মৌলবাদীদের।

ডি জি এফ আই এর ব্যর্থতা :

এরূপ একটা জঘন্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ডিজি এফআই কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। ১৪ই আগষ্ট ১৯৭৫ রাত্রি দশটা থেকে বারটা পর্যন্ত বেঙ্গল ল্যান্সারে একটি গোপন বৈঠক হয়। এ বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যোগদান করেন। কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থা তা ধরতে পারে নাই। এমনটি হতে পারে না। বরং গোয়েন্দা সংস্থার কতিপয় ব্যক্তি ঐ বৈঠকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে তা প্রকাশ পায় নাই, তবে প্রাক্তন পরিচালক ব্রিগেডিয়ার রউফ সেদিন অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে তার কতিপয় সাক্ষাৎকার দুরভিসন্ধিমুলক। তিনি হয় তার ব্যর্থতাকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন নতুবা তিনিও পনেরই আগষ্ট ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নইলে তিনি দু-দুবার সেনাপ্রধানের বাড়ি না গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বাড়ি থেকে সরে যেতে বলতে পারতেন। কারণ রাত দুটা আড়াইটায় ট্যাংক বের করে ঢাকা শহরের দিকে গমনের সময় কাউন্টার ইন্টিলেজেন্ট এর পরিচালক তাকে জানিয়ে ছিলেন এবং তিনি ফোনে সে কথা জেনারেল সফিউল্লাহকে জানিয়ে ছিলেন। এটা ছিল অস্বাভাবিক মুভ। গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক যখন তাকে খবর দিলেন, তখন তিনি সে কথা বলতে পারতেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কি করছিলেন ?

বিডিআর চীফ খলিলুর রহমানের ব্যর্থতা :

সে সময়ে তিনিই ছিলেন সিনিয়র টাইগার। বাংলাদেশ রাইফেলস এর পরিচালক। ভোরবেলা জল্লাদবাহিনী তাকে ধরে আনে। তাকে তিন বাহিনীর চীফ বানাবার টোপ দেয়। অস্ত্রের মুখে তিনিও মোশতাকের আনুগত্য স্বীকার করে জল্লাদবাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডকে স্বীকার করেন। ঘাতকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাই। তার নিঃশর্ত আত্ম—সমর্পণ সিনিয়র টাইগার হিসাবে তার জীবনকেও কালিমা লিপ্ত করেছে।

ঢাকা পদাতিক ব্রিগেডের দূরবস্থা :

সেনাপ্রধান ডালিমের প্রতি রাগ করে সেনাসদর থেকে ঢাকা পদাতিক ব্রিগেডে গেলেন পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করতে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে অবাক ও অসহায় অবস্থায় পড়লেন। কারণ ততক্ষণে জল্লাদ

বাহিনীর ট্যাংক দ্বারা ঢাকা গ্যারিসন এক প্রকার অবরুদ্ধ। আর ট্যাংকের ভয়ে পদাতিক সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজি ছিল না। ফলে ব্রিগেড কমাণ্ডার সেনাপ্রধান ও সিজিএস এর নির্দেশ কার্যকরী করতে পারলেন না। তিনি সেনা উপ-প্রধানের সাহায্য চাইলেন, তিনি সুযোগের পুরা ব্যবহার করলেন। আপাতত কোনো কার্যব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পরামর্শ দিলেন। কর্ণেল সাফায়াত হয়ে পড়লেন স্থবির, নিশ্চল পাথর।

ও দিকে ফাষ্ট ইষ্টবেঙ্গল অফিসে চাপের মুখে সেনাপ্রধান আনুগত্যের কাগজে সই করলেন। ঠিক সে সময়ে জেনারেল জিয়া উক্ত অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। চোখ ইশারায় ডালিমকে কি যেন বললেন। মনে মনে খুব খুশি হয়ে মেজর রশীদ বললেন, ধন্যবাদ স্যার। এখন স্যার রেডিও ষ্টেশনে যেতে হবে। ওখানে সবাই অপেক্ষা করছে। প্লিজ চলুন স্যার।

এমন সময় কে একজন বাইরে চিৎকার করছে, ট্যাংক দিয়ে ঘেরাও করে ফেলেছে। একটা ট্যাংক এদিকে এগিয়ে আসছে।

তার কথায় সবার মনে আতঙ্ক।

মেজর রশীদ আবার বললেন, সময় নষ্ট করে লাভ কি স্যার। এতে দেশেরই ক্ষতি হবে।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেনাপ্রধান বললেন, রেডিও ষ্টেশনে আমি একা যাব না। অন্য চীফদের সঙ্গে আলাপ করব।

মেজর রশীদেরাই দুই বাহিনী প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং সিজিএস তাদের সঙ্গে আলাপ করে সফিউল্লাহর সঙ্গে আলাপ করান। দুই প্রধান বললেন, অপেক্ষা করুন, আসছি। তারা আসলে তাদের সঙ্গে আলাপ করলেন এবং তাদের ফ্লট করে রেডিও ষ্টেশনে নেয়া হল। আর অবাক বিস্ময়ে ব্রিগেড বাহিনী সে দৃশ্য অবলোকন করলেন।

সেনাবাহিনীর লোভ :

বেতার থেকে বারবার সেনাবাহিনী কর্তৃক দেশের সর্বময় ক্ষমতা দখলের কথা বলা হচ্ছে। অথচ তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এ এক গোলক বাঁধা, জল্লাদদের কৌশলী প্রচার। সবাই যেন বুঝেও বোবা। চারিদিকে থম থমে ভাব।[৪] সাঁজোয়া আর গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যদের এ পৈশাচিক কাজের জন্য তাদের মনেও প্রতিশোধ স্পৃহা। কিন্তু অধিনায়করা ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন। তাদের জানান হল কয়েকজন বিপদগামী মেজরেরা এ কাজ করেছে। আপনারা শান্ত থাকুন। এদিকে সব ঠিক আছে। শত শত সৈনিকেরা প্রতিশোধের জন্য চাপ দিলেও অফিসারেরা সিনিয়ারদের কৌশলে বাধা পড়লেন। কারণ বিষবৃক্ষ ইতিমধ্যে কমাণ্ডারদের সামরিক

আইনের আবডালে ক্ষমতা, ঐশর্য, প্রতিপত্তির টোপ পান করিয়েছেন তারা শাসক হবার স্বপ্নে বিভোর হলেন। আর নির্দেশের অভাবে সারা দেশের সৈন্যরা নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। জিয়ার উদ্দেশ্য হাসিল হলো।

সেনাপ্রধান অসহায়ভাবে ঘৃণীত চোখে একবার ওদের প্রতি তাকালেন। তার পর ভিজে বিড়ালের মতো করে উঠে সেনাসদর ফিরে গেলেন। ইতি-মধ্যে জল্লাদবাহিনী ও বাংলার বিষবৃক্ষ সেনানিবাসের সকল অফিসারদের একত্রিত করেছিলেন। সেনাপ্রধান তাদের ঘটনা বর্ণনা করলেন যেভাবে তাকে জল্লাদেরা বলতে বলেছিলেন। তিনি অফিসারদের শান্ত থাকতে শৃংখলা ফিরে আনতে অর্থাৎ জল্লাদদের নির্দেশ মেনে চলতে শলাপরামর্শ দিলেন। তিনি সত্য কথাটি বলতে পারলেন না, তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে জল্লাদদের জঘন্য অপরাধের জন্য প্রতিবাদ করতে, তাদের প্রতিরোধ করার জন্য নির্দেশ দিতে ব্যর্থ হলেন।

আর সেনাকর্মকর্তারা একাত্তরের ২৫শে মার্চ যেমন পাক বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, তেমনি পচাঁত্তরের পনেরই আগষ্ট ক্ষমতা লোভি জল্লাদবাহিনীকে ঠেকাতে ব্যর্থ হলেন। পলাশীর মাঠে হাজার হাজার বাঙ্গালি সিরাজউদৌল্লার পরাজয় দৃশ্য দেখে যেমন হাত তালি দিয়েছিলেন তেমনি সফিউল্লাহর ভাষণ শুনে যেন অফিসারেরা হাত তালি দিলেন। এবার ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর স্থানে সি আই এ-এর দালালদের হাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বন্দী হয়ে গেল। একাত্তরের চাকা পঁচাত্তরে ঘুরে গেল। একাত্তরে পরাজিত কিসিঞ্জার পঁচাত্তরে বিজয়ী বীর।

তোফায়েলের ও রক্ষীবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা :

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের ফোনেই রক্ষীবাহিনীর সদরদপ্তর জানতে পারে রাষ্ট্রপতির বাড়ি জল্লাদবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। পরি-চালকের অবর্তমানে ভার প্রাপ্ত পরিচালক আবুল হোসেন ভীত ও সন্ত্রস্ত। সিদ্ধান্তহীনতায় নিথর।[৬] অবশেষে ভয়ে পলাতক। ভীরু কাপুরুষ। রক্ষী জীপে তোফায়েল আহমদকে আনা হয়। তিনি রক্ষীদের বঙ্গবন্ধুকে উদ্ধারের জন্য অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করলেন। ট্যাংক ও কামান দেখে অফি-সারেরা ভীত। বললেন, স্যার, বন্দুক দিয়ে ট্যাংকের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। ইতিমধ্যে ঘাতক জল্লাদবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। তোফায়েল সে সংবাদ শুনে শোকবিহবল। তিনিও সিদ্ধান্তে অপারগ। সাহসহীন।

অথচ হাজার হাজার রক্ষী তুমুল উত্তেজনায় প্রতিশোধের নির্দেশের অপেক্ষায়। পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল, ময়মন-

সিংহ, টাঙ্গাইল, পটুয়াখালী ক্যাম্প সমূহে শত শত রক্ষী ইউনিফর্ম পরে নির্দেশের অপেক্ষায় উত্তেজনায় কাঁপছে। তাদের সঙ্গে হাজার হাজার যুবক. ছাত্র, জনতা, একাত্তরের বিপ্লবী আত্মারা ক্যাম্পের সঙ্গে একাত্ততা ঘোষণা করেছে। কিন্তু নির্দেশের অভাবে বিশাল এবং সজ্জিত রক্ষীবাহিনী হতাশায় নৈরাশ্যে মৃত বাঘের মতো বাংলার নরম মাটিতে হাত পা ছড়িয়ে নিঃসাড় স্পন্দনহীন হয়ে থাকলো।[৪] গোলাবিহীন ট্যাংক ও কামান এর গুলির ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল, কেউ তাদের একটি আঘাতও আনল না। যদি জানত, ওরা খান খান হয়ে যেত। জল্লাদবাহিনী তখনই ধ্বংস হত এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েও তা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হলেন তোফায়েল আহমেদ।

ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা :

পৌনে ছটায় ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী এম মুনসুর আলীর বাসায় লাল টেলিফোনে তারা আলাপ করলেন। কিন্তু তারাও একবার ভাবলেন না যে ঘাতকবাহিনী তাদেরও আঘাত হানতে পারে। কারণ তারাও বঙ্গবন্ধুর আত্মার আত্মা ছিলেন। বাসা থেকে সরে যেতেন কারণ তখনও ঘাতকবাহিনীর দস্যুরা তাদের বাড়ি পৌঁছে নাই।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেনাপ্রধানের আলাপ :

প্রধানমন্ত্রী এম মুনসুর আলীর সঙ্গে ফোনে সেনাপ্রধান সফিউল্লাহর কথা হলো। প্রধানমন্ত্রী মোশতাককে গ্রেফতার এবং রাষ্ট্রপতিকে উদ্ধার করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা নিজেদের উদ্ধারের কথা একবারও ভাবলেন না।

বিমানবাহিনী প্রধানের প্রতিশ্রুতি :

বিমানবাহিনী প্রধান এ কে খোন্দকার বাংলাদেশ বেতারে বোম্বিং করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু তা করতে পারেন নি। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি আই জি ই এ চৌধুরীকে পাল্টা ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, আই জির সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কিন্তু ট্যাংক কামানের বিরুদ্ধে তারাও কোনো ব্যবস্থা নিতে পারলেন না।

পুলিশ বিডিআর নিষ্ক্রিয় ছিলেন :

দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হয়েছে প্রচারিত হবার পর পুলিশ বিডিআর ও রক্ষীদের মতো সকলেই দিশে-হারা। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে তারাও সাহসী হলেন না।

বিষণ সমাবেশ

বাংলাদেশ বেতার শাহবাগ :

পরিকল্পনা মোতাবেক মেজর মহিউদ্দিন বেতার ভবন দখল করেন। বঙ্গ-বন্ধুকে হত্যার পর জল্লাদবাহিনীর কমাণ্ডারেরা দ্রুত বেতারভবনে আগমন করেন। জেনারেল জিয়া ঠিক ছয়টায় বেতারভবনে পৌঁছেন। মেজর ডালিমকে উহা প্রচারের ইঙ্গিত দিলেন এবং দ্রুত সেনানিবাসে ফিরে গেলেন। তার সঙ্গে কমাণ্ডারেরা যার যার কর্তব্যে আবার গমন করলেন।

রাষ্ট্রপতি তথা মন্ত্রীপরিষদ গঠনের পূর্বেই মুজিব হত্যার সংবাদ প্রচার নিষেধ ছিল। কিন্তু জিয়ার নির্দেশে ঘাতক জল্লাদ বাহিনীর সব কমাণ্ডারেরা বেতার ভবনে ফেরার পূর্বেই মেজর ডালিম ভোর ৬টা ১ মিনিটে ঘোষণা করলেন :

আমি মেজর ডালিম বলছি—স্বৈরাচার শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। জননেতা খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। দেশে সামরিক আইন জারী করা হয়েছে এবং সারা দেশে কারফিউ জারী করা হয়েছে। বাংলাদেশ এখন থেকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হবে। সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল এম সফিউল্লাহ সেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন। তার জায়গায় সেনাপ্রধান নিয়োজিত হয়েছে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) পি এস সি। তিন বাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়েছে ব্রিগেডিয়ার খলিলুর রহমানকে, এবং তাকে মেজর জেনারেল পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

এ ঘোষণার অংশ বিশেষ মাঝে মাঝে বেতার থেকে পুনঃ প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু এতো সকালে সাধারণতঃ ঢাকার রেডিও বাংলাদেশ কেউ শোনে না। ফলে ডালিমের ঘোষণা সাতটা দশ মিনিটের আগে অধিকাংশ লোক জানতে পারে নি। সকাল সাতটায় ঢাকা বেতার কেন্দ্র বন্ধ ছিল। তখন শুধু শো শো করছিল। সম্ভবত সাতটা বার মিনিটের সময় ডালিমের পুনঃ প্রচারিত ভাষণটি দেশবাসী প্রথম শুনতে পায়। ততক্ষণে জল্লাদবাহিনী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। কতিপয় বাড়িতে নিরাপত্তার দায়িত্বে সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে।

তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মাহবুব আলম চাষী, মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোষ্টার। ২ ফিল্ড আর্টিলারী অপারেশন রুম থেকে বেতার ভবনে আসেন। মেজর ফারুক ও মেজর ডালিম মোশতাকের বাড়িতে যান। বাড়িতে মিলিটারী

দেখেই মোশতাক অজ্ঞান হন। পাঁজা করে তাকে গাড়িতে তোলা হয়। তখনও অজ্ঞান হন। বেতারে আসলে জেনারেল জিয়া বললেন, এখন একটু শক্ত হোন। আপনি এখন থেকে প্রেসিডেন্ট। এখন আপনাকে গার্ড অব অনার দেয়া হবে।

মেজর ডালিম কমাণ্ড দেয়। রিসালদার ওবায়েদুল হক, দফাদার সাইদুর, দফাদার সালেক গার্ড অব অনারে অংশ নেয়।[২]

ক্ষট করে সেনাপ্রধান, নৌপ্রধান ও বিমানপ্রধানকে আনা হয়। পুলিশ আই জি, বিডিআর প্রধান ব্রিগেডিয়ার খলিলুর রহমানকে, রক্ষীবাহিনী প্রধান (ভার প্রাপ্ত) আবুল হোসেনকেও আনা হয়।

সেনাপ্রধানকে খোন্দকার মোশতাকের রুমে নেয়া হল। তখন মোশতাকের বাম পাশে দাঁড়ান ছিলেন, প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর। ডান পাশে একটি মাইক্রোফোন। তাকে দেখেই মোশতাক বললেন, সফিউল্লাহ অভিনন্দন। তোমার সেন্যরা একটি বিরাট কাজ করেছে। এখন বাকিটা করো।

: আর বাকি কি আছে, সেনাপ্রধান প্রশ্ন করলেন।

: তোমারই সেটা জানা দরকার—মোশতাক বললেন।

: তাহলে সেটা আমার উপরেই ছেড়ে দিন। এই বলে সঙ্গে সঙ্গে সেনা-প্রধান রুম থেকে চলে আসতে থাকেন। তখন তাহের উদ্দিন ঠাকুর মোশ-তাককে বলতে থাকেন, স্যার, উনাকে থাকতে বলুন, উনাকে থাকতে হবে। রেডিওতে একটি ঘোষণা দিতে হবে।'[৮]

সেনাপ্রধানের গতিরোধ করা হলো। তাহের উদ্দিন ঠাকুর একটা কাগজ দিলেন। তিন দিন আগে তার বাসাতেই সেটা খসড়া করা হয়েছিল। সেটাই তিন বাহিনী প্রধান, পুলিশ আইজি, বিডিআর প্রধান, রক্ষীবাহিনী প্রধান এক এক করে পাঠ করলেন। অস্ত্রের মুখে তারা সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত—সবাই মিলে তখন প্রতিবাদ করতে পারতেন। ষড়যন্ত্রের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রধানগণ তখন ভেড়ার পাল। তারা সবাই মিলে বাংলাদেশের আর এক মীর জাফরকে সিংহাসনে বসালেন।

তারপর মোশতাক বললেন, "আমি এখনই বঙ্গভবনে যাচ্ছি। জুমার নামাজের আগেই সেখানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। আমি চাই আমার সকল প্রধানরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন।"[৮]

নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধান সেনানিবাসে ফিরে গেলেন। কিন্তু জেনারেল সফিউল্লাহকে বেতারভবন থেকে ভঙ্গভবনে নেয়া হয়। অস্ত্রের মুখে তার কাছ থেকে সি এ এস এর দায়িত্ব জেনারেল জিয়াকে দেয়। এই অস্ত্র ধরে ছিলেন মেজর ফারুক নিজেই। তখন বোষ্টারও হাজির ছিল। মেজর ফারুক ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আপনার কাজ হবে অফিসারদের বুঝিয়ে বলা। বেঙ্গল

রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ানগুলোকে সামলান নইলে আপনার অবস্থাও ওদের মতো হবে।[২]

ওদিকে জেনারেল জিয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোষ্টারকে প্রশ্ন করেন—আমরা এটা করলাম, এখন যদি রক্ষীবাহিনী বিদ্রোহ করে এবং তাদের সঙ্গে ভারতের সেনাবাহিনী প্রবেশ করে তাহলে কিভাবে দেশ রক্ষা পাবে। বোষ্টার উত্তরে বললেন, থাইল্যাণ্ডে ৭০০ ফাইটার তোমাদের জন্য রাখা হয়েছে।[২] সম্ভবত এ তথ্য 'র' আগেই টের পেয়েছিল।

লেঃ কর্ণেল (অবঃ) আবু তাহেরের যোগদান :

পনের আগষ্ট ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক ছিলেন তাহের। কিন্তু জিয়ার দল তাকে বাদ দিয়েই অভ্যুত্থান ঘটায়। অতঃপর তার সমর্থনের জন্য ফোন করে বেতারভবনে আনেন। তিনি সমর্থন দেন তবে মোশতাক মন্ত্রীসভায় যোগদানে বিরত থাকেন। কারণ তিনি জানতেন যে এই পুতুল সরকার স্বল্প দিন টিকে থাকবে। কর্ণেল তাহেরের বেতারভবনে উপস্থিত এবং সমর্থন প্রমাণ করে যে তিনিও পরবর্তী স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনে সমভাবে দায়ী এবং ভাগীদার পাপী। বিষবৃক্ষের মতো তিনিও বাংলার কলঙ্কের কালো ব্রণ।

তাজউদ্দিনের বিশ্বস্ততা :

স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গবন্ধু সরকারের সঙ্গে জনাব তাজউদ্দিনের মত পার্থক্য যতটা না ছিল নীতিগত, তার চেয়ে বেশি ছিল বঙ্গবন্ধু সরকার বিরোধী শক্তির প্রোপাগাণ্ডা। তাজউদ্দিন ভারত-রাশিয়া পন্থী বিধায় বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের প্রচারণা ছিল। তাজউদ্দিনের জন্য যে বঙ্গবন্ধু ভারত-রাশিয়ার প্রতি বেশি আকৃষ্ট নয় তা প্রমাণের জন্যেই মূলতঃ বঙ্গবন্ধু তাকে মন্ত্রী সভা থেকে বাদ দেন। সরকার বিরোধীরা তাজউদ্দিনকে ভুল বুঝলেন। অভ্যুত্থানকারীরা চাল মারতে চাইলেন যে মোশতাক-তাজ মিলেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। তাদের এই ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা সৈন্যদের মধ্যে প্রচার করে যে, তাদের সঙ্গে তাজউদ্দিনও রয়েছেন।

বেতারে ঘোষণা দিয়েই মেজর ডালিম ছুটে গিয়েছিলেন সাতমসজিদ রোডে তাজউদ্দিনের বাসায়। বললেন, স্যার সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে।[৪]

তার বুকটা চিন চিন করে উঠল, মাত্র দশ দিন আগে বঙ্গবন্ধু একটি বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য পেপার তৈরী করতে বলেছিলেন। তাই নিয়ে তিনি

গত রাতেও আলাপ করেছেন। দু'হাতে তিনি নিজের বুক চেপে ধরলেন, একবার চারিদিকে চাইলেন। সামনে ৮/১০ জন সশস্ত্র জল্লাদ।

: স্যার, শেখ আপনাকে খুব অপদস্ত করেছে।

কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু একবার মেজর ডালিমের প্রতি তাকালেন।

একটু মৃদু হেসে জল্লাদ ডালিম আবার বললেন, 'স্যার খোন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি হবেন আর আপনি হবেন প্রধানমন্ত্রী।'

এতক্ষণে তাজউদ্দিনের কণ্ঠে দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠল। সোজা চেয়ে বললেন, ইউ হ্যাভ কিলড ইয়োর ফাদার, ইউ ক্যান কিল এভরি বডি-বাট গেট আউট-ইউ বাসটারড। গেট আউট.....

মেজর ডালিম চমকে উঠলেন। থতমত খেয়ে বললেন, স্যার আপনাকে আমরা সম্মান করি' শ্রদ্ধা করি।

: ইউ শাট আপ—তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে।

ডালিমকে দরজা দেখিয়ে দিলেন। বাম হাতে তখন বুক চেপে ধরে আছেন। ডালিম অস্ত্র নামিয়ে বললেন, কাজটি ভাল করলেন না স্যার।

মেজর ডালিম চলে গেলেন, কিন্তু এক প্লাটুন জল্লাদ তখন থেকে তাদের বাসায় প্রহরী নিযুক্ত করে গেলেন। তিনি আর কোনো দিন মুক্তজীবন ফিরে পান নি। কিন্তু নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি সারাজীবন বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। তার কোন লোভ-লালসা ছিল না।

বঙ্গভবনে :

বেলা এগারটায় জল্লাদবাহিনীর নির্দেশে নামমাত্র সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ বঙ্গভবনে মোশতাক শপথ অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন। শপথ অনুষ্ঠানের পর মোশতাকের নির্দেশে তিনবাহিনী প্রধান, জিয়া এবং খালেদ মার্শাল "ল" জারীর বিষয়ে আলাপ করলেন। কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেটা স্থগিত হলো। সেদিন সন্ধ্যায় মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠানে তিনি আবার যোগদান করলেন।

জেনারেল এম এ মঞ্জুরের দৃশ্যে হাজির :

আগষ্ট ঘটনার সময় কর্ণেল (পরে মেজর জেনারেল) মঞ্জুর দিল্লীতে মিলিটারী এটাসি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ক্ষমতালোভী, উচ্চাবিলাসী এবং তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন এক বীর মুক্তিযোদ্ধা। তাকে দেখে সেনাপ্রধান জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি দিল্লী থেকে কিভাবে এলে। মঞ্জুর জবাব দিলেন, আমি খবর জেনে রাস্তা দিয়ে ঢাকায় চলে এসেছি। অবশ্য সফিউল্লাহ, এভাবে আসার

জন্য মঞ্জুরের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন নাই, নেয়া প্রয়োজনও মনে করেন নাই। কারণ তখন তার নিজেরই পায়ের নিচের মাটি সরে গিয়েছিল

এসময় (বঙ্গভবনে) সফিউল্লাহ জেনারেল এম এ জি ওসমানীর নিকট ফোন করেন। তিনি বললেন, সফিউল্লাহ অভিনন্দন নাও।

: স্যার, আপনি কি মনে করেন এটা অভিনন্দনযোগ্য।

: তুমি কি জান না তুমি দেশকে বাঁচিয়ে দিয়েছো?

সফিউল্লাহ সম্মেলন কক্ষে ফিরে দেখলেন, মোশতাকের সঙ্গে মঞ্জুর এক কোণে আলাপ করছেন। সফিউল্লাহ মনে মনে ভাবছেন—সেনাপ্রধানের বিনা অনুমতিতে মঞ্জুর দিল্লী থেকে এভাবে কেন এলো? কার হুকুমে।

বৈঠক শুরু হলো। এক পর্যায়ে কথা উঠলো, মার্শাল ল দেয়া হবে কিনা। সফিউল্লাহ বললেন, এ নিয়ে আলোচনার কি আছে। এটাতো ঘোষিত হয়ে গেছে। এখন শুধু আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্ন। এতে মোশতাক বললেন, কে এর দায়িত্ব নেবে?

: রাষ্ট্রপতি। সফিউল্লাহ বললেন।

: কেন রাষ্ট্রপতি! তোমার বাহিনী এটা করেছে, তোমাকে দায়িত্ব নিতে হবে।

: আমি দায়িত্ব নিতে ভীত নই। কিন্তু ওরা যদি আমার বাহিনী হতো তাহলে তো আমার নামে ঘোষণা দিতো। তারা তো আপনার নামে ঘোষণা দিয়েছে?

কথা ঘুরিয়ে মোশতাক বললেন, আমরা আলোচনা করছি, সামরিক আইন জারী করা হবে কিনা, তা নিয়ে। মোশতাক মৃদু হাসলেন।

পরের কটা দিন এবং বিষবৃক্ষের অভিষেক :

সেদিন কোনো সিদ্ধান্ত হলো না। পরের দুদিনেও না। তখন মূলত জল্লাদবাহিনীও বিষবৃক্ষ সেনাপ্রধানকে বঙ্গভবনে আলোচনার নামে বন্দী করে রাখে। আর এ ব্যাপারে তাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে বিবিসি ভয়া সহ পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলি। তারা মুজিব সরকারের নানারূপ কল্পিত কাহিনী প্রচার করছিল আর জিয়াকে হিরো বানাতে ছিল। এভাবে সেনাবাহিনীর সবাই জেনেছিল যে জিয়াকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হয়েছে এবং এসব পরিবর্তন তার দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। মোশতাক নামমাত্র রাষ্ট্রপতি। আসল চাবিকাঠি জিয়ার হাতে। তাই পদোন্নতি, ক্ষমতা লাভ, ইত্যাদির প্রত্যাশায় সকল অফিসার, ন্যায়নীতি, দেশ ও জাতিস্বার্থের চেয়ে তাদের নিজেদের ভাগ্য গড়ার প্রতিযোগিতায় জিয়াকে বেশি সমর্থন

দিতে পারেন তারই খেলায় মেতে উঠেন। সেই সঙ্গে মুজিব সরকার বিরোধী প্রচারনায় সেনানিবাসসমূহে জল্লাদবাহিনীর এজেন্টদের স্বার্থহীনভাবে সাহায্য—সহযোগিতা দিতে থাকেন। নির্বোধ সৈন্যরা ঠিক ক্লাইন্ডের ফাঁদের মতো জিয়ার ফাঁদে পড়ে। রাষ্ট্র ক্ষমতা জনসাধারণের নিকট থেকে সেনা-নায়কদের হাতে এবং বঙ্গভবন থেকে ঢাকা সেনানিবাসে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

বঙ্গভবনে অবস্থানের সময় সেনাপ্রধান জানতে পারলেন যে, গোলা বারুদ ছাড়াই জল্লাদবাহিনী ট্যাংক নিয়ে পনের তারিখে হত্যাকাণ্ড চালায় এবং চাপের মুখে ১লা আগষ্ট সকালে সিজিএস (খালেদ) ট্যাংক ও কামানের গোলা বারুদ সেনাপ্রধানের অনুমতি ছাড়াই প্রদান করেন। তিনি আরও জানতে পারেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্র অনেক দিনের এবং উপ-সেনাপ্রধানসহ অনেক সিনিয়র অফিসার—এর সঙ্গে বড়িত ছিলেন।

সামরিক আইনজারীর ঘোষণাপত্র ও অন্যান্য দস্তাবেজে স্বাক্ষর করার পর ১৮ই আগষ্ট তাকে সেনাভবনে ফিরতে দেয়া হয়। সে রাতেই তিনি একটি জরুরী বৈঠক করেন। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তিন বাহিনী প্রধান, পুলিশের আইজি, জেনারেল জিয়া, পি এস ও, ব্রিগেডিয়ার রউফ, সিজিএস খালেদ মোশাররফ, ডি এম ও কর্ণেল মালেক, জি এস ও, ১ লেঃ কর্ণেল (এখন লেঃ জেনারেল) নুরুদ্দীন খান।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে অভ্যুত্থানকারীদের শাস্তি দেয়া হবে এবং সেনা-বাহিনীর চেইন অব কমাণ্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু সব গোপন আলোচনা বঙ্গভবনে পাচার হয়ে যায়। কারা এটা করেছে?

১৯শে আগষ্ট সেনাপ্রধান সকল ব্রিগেড কমাণ্ডারদের নিয়ে একটি আলো-চনা সভা করেন। কিন্তু কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারেন নাই। কারণ ৫ জন ব্রিগেড কমাণ্ডারের মধ্যে ৩ জন ছিলেন জিয়ার সমর্থক। তদুপরি জিয়া নিজেই এ সকল কার্যব্যবস্থার বিরুদ্ধে গোপনে তৎপর ছিলেন।

মেজর ফারুক রশীদকে সেনানিবাসে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন কিন্তু তারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করলেন। সেনাপ্রধান নয়া অবৈধ রাষ্ট্রপতিকে এ কথা জানালেন। তিনি বললেন, ওরা ভীত। সময় দাও।

কিন্তু ঘাতকবাহিনী তাকে আর বেশি দিন সময় দেন নাই। ২৪শে আগষ্ট মোশতাক তাকে বরখাস্ত করেন। ঐ তারিখে জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়, ব্রিগেডিয়ার খলিলুর রহমানকে মেজর জেনারেলের পদোন্নতি এবং বাহিনী স্টাফ প্রধান নিয়োগের ব্রিগেডিয়ার দস্তগীরকে বিডি আর প্রধান নিয়োগ করার ঘোষণা

দেয়া হয় এবং দুপুরে রেডিও খবরে প্রচার করা হয়। মোশতাক ফোন করে সফিউল্লাকে বলেন, তুমি খবর শুনেছ।

: জি। এটা ভাল খবর।

: আমি তোমাকে সাড়ে পাঁচটায় ভঙ্গভবনে চাই।

জেনারেল সফিউল্লাহ বঙ্গভবনে বিকালে পৌঁছতেই একজন অফিসার তাকে জানান যে জেনারেল ওসমানী সালাম দিয়েছেন। তিনি তার কাছে গেলেন। একটু আলাপের পর ওসমানী বললেন, তুমি দেশের জন্য অনেক করেছ। দেশ তোমাকে চায়। এখন তোমার ভূমিকা বিদেশের মাটিতে দেখতে চাই। তোমাকে বিদেশে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হবে।

এভাবে তাকে পদচ্যুত করা হলো। আর সে কাজটি করানো হলো বঙ্গবীর এমএজি ওসমানীকে দিয়ে। কারণ জেনারেল জিয়া সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও ওসমানী সফিউল্লাহকেই সেনাপ্রধানের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। আগস্ট ষড়যন্ত্রকারী এ জাতীয় কয়েকটি কাজ করানোর জন্যই তাকে রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা নিয়োগ করেছিলেন। বঙ্গবীর তাদের মতলব বুঝতে পারেন নাই এবং সে সময় তাঁর সহযোগিতা ঘাতকবাহিনীকে শক্তিশালী হতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। তাদের মতলব হাসিল হলে তাকেও বিদায় করেছিলেন। ততদিনে তার বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ কলঙ্ক দেশ ও জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। তার মিত্ররা ততদিনে তার বিরুদ্ধপক্ষ। যেদিন ওসমানী তা টের পেলেন তখন তার পায়ের নিচের মাটি অনেক গভীরে সরে গেছে। পনের থেকে ২৪শে আগস্ট মাত্র ১০ দিন। আর দশ দিনেই বিষবৃক্ষ তার ডালপালা সারাদেশে মেলে ধরেছে।

পতাকা উত্তোলনের পবিত্রতম সময়ে জল্লাদবাহিনী বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম সন্তানকে হত্যা করে বাঙালির গণতান্ত্রিক গতিধারাকে শুধু স্তব্ধই করে নাই; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের নিকট থেকে সেনানিবাস তথা স্বৈরনায়কের হাতে বাক্সবন্দী করে।

পনেরই আগষ্ট হত্যাকাণ্ড না সামরিক অভ্যুত্থান

স্বাধীন বাংলার প্রথম প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ, বীর উত্তম পচাঁত্তরের ১৫ই আগষ্ট রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা ও অন্যান্য ঘটনাবলী সামরিক অভ্যুত্থান না বলে সেনাবাহিনীর ভিতরের ও বাহিরের একটি ছোট দলের সন্ত্রাসী কাজ বলে অখ্যায়িত করেছেন। হলি ডে সম্পাদক জনাব এনায়েতুল্লাহ খানও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধিকন্তু এ সময়ে খোদ সেনাবাহিনীতেও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে এটা মেজর ফারুকের দলের মাত্র ৬/৭ জন মেজরের কাজ। বিবিসি ভোয়া সহ পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলিও এই একই রূপ প্রচারণা চালিয়েছিল। এই প্রচারণার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আর তা হল এই ঘটনার মূল নায়ককে আড়াল করা এবং প্রকারান্তরে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করা। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর পক্ষের শক্তিগুলিকে ক্ষতবিক্ষত করা এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করা, হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো পাল্টা ব্যবস্থা না নেবার সুযোগ বন্ধ করা। বাস্তবেও তাই হয়েছে। ইহা অবশ্যই সামরিক অভ্যুত্থান তবে এটা সামরিক বাহিনীর ক্ষুদ্র একটি শক্তিশালী দলের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। এই ক্ষুদ্র অংশে সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের সমর্থন ছিল না, কিন্তু উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সমর্থন ছিল। যেমন পাঁচ জন ব্রিগেড কমাণ্ডার এর মধ্যে তিন জন। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমাণ্ডারদের মধ্যে বেশির ভাগ সেক্টর কামাণ্ডার সাব-সেক্টর কমাণ্ডার পাকফেরত অফিসারদের মধ্যে সিনিয়র অফিসারগণ। আর একটি কথা, এ জাতীয় অভ্যুত্থান সামরিক বাহিনীর ছোট একটি দলের দ্বারাই সাধারণত সংঘটিত হয়। সাধারণ সৈনিক তো দূরের কথা, মাঝারি ধরনের অফিসারেরাও তা জানতে পারেন না। অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জানান হয় এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়। তখন নিজ স্বার্থেই সেনাবাহিনীর সদস্যরা সমর্থন দেয়।

১৯৭৫ সালের ঘটনাটাও ঠিক এমন ধরনের ছিল। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈনিকদের দ্বারা। স্বাধীনতার পর এই অফিসারেরা পাক থেকে প্রত্যাবর্তনকৃত অফিসারদের জুনিয়র হয়ে যায়। তাই তাদের ক্ষোভ ছিল পাক ফেরত অফিসারদের বিরুদ্ধে। আবার পাক ফেরত অফিসারদের কিছু সিনিয়র সদস্য মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের দুই বছর সিনিয়রিটির কারণে জুনিয়র হওয়ায় তাদেরও ক্ষোভ ছিল। এই সন্ত্রাসী দলটিই তখন ক্ষমতা লিপ্সু হয়ে ওঠে। তারা তখন সরকার বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে। যাদের সুযোগ ছিল তারা সেনা-

বাহিনী হতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে কেউবা ব্যবসা বাণিজ্যে, কেউবা রাজনীতিতে আর কেউবা বেসামরিক চাকুরীতে, বিশেষ করে পুলিশে যোগদান করে। পঁচাত্তর-উত্তর ঘটনাবলীতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই অফিসারগণই বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরা সবাই কোটিপতি শিল্পপতি, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী সংসদ সদস্য হয়েছেন অনেকেই। এখন আর এরা মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা বলে আক্ষেপ করেন না। এখন এরা বাংলাদেশের শাসক—কুলের বেয়াই বেয়াই সমাজপতি। এরাই এখন বঙ্গভবন, সুগন্ধার কলকবজা এবং সচিবালয়ের চাবিকাঠি।

এখানে আরো একটি বিষয়ে বলে রাখা দরকার যে, অভ্যুত্থানকারীরা সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে সক্ষম হয় যে, উক্ত হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল কয়েকজন অফিসারদের দ্বারা ব্যক্তি আক্রোশের জন্য। এই প্রচারণা ছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিত এবং বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ ব্যক্তি আক্রোশে সেদিনের হত্যাকাণ্ড হয় নাই। ঐ প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল জনগণ ও সাধারণ সৈনিকদের বিভ্রান্ত করা এবং গণবিক্ষোভকে প্রশমিত করা যে তা মাত্র কজন অফিসার অঘটন ঘটিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। জনগণ ও সাধারণ সৈনিকরা এমন একটা আশা পোষণ করছিল।

উক্ত অফিসারদের ব্যক্তি আক্রোশ ঘটনাগুলোও ছিল ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ ঘটনার পূর্বের রাতে জল্লাদদের দু'জন অফিসার বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে আত্মীয়ের মতো আদর যত্ন গ্রহণ করেছিলেন।

পনেরই আগষ্ট ঘটনার সঙ্গে সেনাপ্রধান এবং ক্ষুদ্র একটি দল জড়িত ছিলেন না। বাদ বাকি সবাই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন বলেই সেনা-প্রধান পনের তারিখের পর দশ দশটি দিন ক্ষমতায় থেকেও অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে সমর্থন হন নাই। তখন যদি তার সমর্থনে সেনাবাহিনীর গরিষ্ট সংখ্যার অফিসার থাকতো তাহলে তো তিনি ক্ষমতাচ্যুত হতেন না এবং তথাকথিত ক্ষুদ্রতম অংশ সফলতা লাভ করত না।

বাস্তব কথা হলো অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং সেনাপ্রধান হিসাবে জেনারেল সফিউল্লাহর ব্যর্থতায় পনেরই আগষ্ট অভ্যুত্থানটি সংঘটিত হতে পেরেছিল এবং পরবর্তীতে সফলতা পেয়েছিল। সেনাপ্রধান হিসাবে তিনি অভ্যুত্থানকারীকে চিনতেন, জানতেন কিন্তু তাকে প্রতিহত করতে যেমন চেষ্টা করেন নাই তেমনি বর্বর হত্যাকাণ্ডের পরেও অভ্যুত্থানকারীকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। সেনাপ্রধানের কোনো অজ্ঞাত দুর্বলতার কারণেই যা তখন হতে পেরেছিল অন্যথায় সেনাসদরের পিওন কিংবা এক-জন সাধারণ সৈনিকও তখন জানতেন পনেরই আগষ্টের ঘটনা কে ঘটিয়েছে।

অথচ সেই সেনাপ্রধান ১৯৯৩ সালে এসেও সত্য কথা বলতে সাহস পান না। এ কারণেই যে তাহলে তার দুর্বলতার কথাই প্রকাশ পাবে এবং তিনি সত্যের সামনা সামনি হতে এখনো সাহস পান না।

অভ্যুত্থানটি ছিল গভীর ও ব্যাপক ষড়যন্ত্রের ফসল :

১৯৭১ সালের ২৮শে মার্চ মেজর জিয়ার দ্বিতীয় রেডিও ভাষণে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণার মাধ্যমে যে ষড়যন্ত্রের সূচনা মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তার শাখা-প্রশাখার অনেক প্রসার লাভ, স্বাধীনতা উত্তর স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি রাজাকার-আলবদর ও জাসদ, বাম পন্থীরা সর্বহারাদের সমর্থন ; আন্তর্জাতিক শক্তি তথা সিআইএ কিসিঞ্জার, সৌদি আরব, চীন, পাকিস্তানের সহযোগিতায় পরিপক্কতা লাভ এবং পাকিস্তান ফেরত সেনা কর্মকর্তা-দের প্রত্যক্ষ সাহায্য সহযোগিতা পঁচাত্তরের পনেরই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে উহা বাস্তবায়িত হয়।

অভ্যুত্থানটি ছিল ক্ষমতা দখলের দীর্ঘকালীন একটি ষড়যন্ত্র :

মেজর ফারুক রশীদ অনেক আগে থেকেই এই অভ্যুত্থানের বিষয়ে মাঝে মধ্যে সমমনা অফিসারদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতেন। এ ব্যাপারে একবার তিনি কর্ণেল আমিন আহমেদ চৌধুরী, মেজর হাফিজ, মেজর গাফ্ফার, মেজর নাসির, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত প্রমুখের সঙ্গে আলাপ করেন।[৬]

আগষ্ট অভ্যুত্থানটি ছিল ক্ষমতা দখলের জন্য দীর্ঘকালীন একটি ষড়যন্ত্র :

সেনাবাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এটা কার্যকরী করা হয়। পনের আগষ্ট সকালবেলা মেজর রশীদ সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহকে সে কথা স্বীকার করেছিলেন।[৮] একই দিনে মেজর ডালিম সেনাসদরে সকলের সামনে সেই অভ্যুত্থানের জন্য জেনারেল জিয়াকে নাটের গুরু বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

আগষ্ট অভ্যুত্থান

নাইট প্যারেড :

ষড়যন্ত্রকারীরা অভ্যুত্থানকে বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৫ সালের ১৪/১৫ আগষ্ট রাতে সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনীর নৈশ্যকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। তারা সুকৌশলে সেনাসদরের সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তরের যোগসাজশে সেনাপ্রধান ও সিজিএস এর অজ্ঞাতে উপ-সেনাপ্রধানের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহণ করেন। শেষ মুহূর্তে তারা ঐ প্রশিক্ষণের সময় সীমাও রাত্রি বারটার স্থলে তিনটা পর্যন্ত বর্ধিত করে নেন। উক্ত প্রশিক্ষণে কেবল মাত্র বেঙ্গল ল্যান্সার এবং ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী অংশগ্রহণ করার অনুমতি গ্রহণ করা হয়।

ল্যান্সার বৈঠক :

ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত অভিযানের পূর্বে ১৪ই আগষ্ট রাত্রি সাড়ে নয়টায় বেঙ্গল ল্যান্সারে একটি বৈঠক করে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ বোস্টার ৯টা ৪৫ মিনিটে উক্ত বৈঠকে যোগদানের জন্য বেঙ্গল ল্যান্সারে উপস্থিত হন। উক্ত বৈঠকে আর যারা যোগদান করেন তারা হলেন সেনা উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, মেজর জেনারেল (অবঃ) এম আই করিম, মেজর রশীদ, মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর (অবঃ) জলিল, ফনিভূষণ মজুমদার প্রমুখ ছাড়াও লেঃ জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনের তরফ থেকে একজন প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক উপস্থিত ছিলেন। বেঙ্গল ল্যান্সার এর ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর ফারুক রহমানের অফিসে উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তারা অনেকক্ষণ ধরে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের সঙ্গে আলাপ করেন। মেজর ফারুক তাদের চূড়ান্ত পরিকল্পনা জানান। সি ও'র অফিসের চারিধারে গার্ড হিসাবে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, নায়েব রিসালদার সারোয়ার হোসেন, দফাদার বদরুদ্দিন, দফাদার ইউনুস, দফাদার লুৎফর ছিল।[২] ৬টি ট্যাংকের অনুমতি ছিল কিন্তু মেজর ফারুক ৬ এর বামে ৩ বসিয়ে ৩৬ করেন।

হত্যা পরিকল্পনা :

এক. জিয়া বিমান বন্দরে নাইট ট্রেনিং রাত্রি দশটা থেকে রাত্রি তিনটা পর্যন্ত।

দুই. ২ ফিল্ড আর্টিলারী যোগ দিবে এবং রাত্রি ৩টা পর্যন্ত সম্মিলিত প্রশিক্ষণ চলবে।

তিন. অস্ত্র ব্যক্তিগত হাতিয়ার এবং এ্যামিনেশান সকলের সঙ্গে থাকবে। প্যাক ০৮ ভর্তি এ্যামিনেশান হবে।

চার. জনবল। ট্রেনিং শেষে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া বাকী সবাই ইউ-নিটে ফিরে যাবে। সাঁজোয়া গোলন্দাজ বাহিনীর ৫০/৫০ এবং ইষ্ট-বেঙ্গলের ২০ জন নির্বাচিত সৈনিক একটি বিশেষ মিশনে/ট্রেনিং এ অংশ নিবে।

পাঁচ. অপারেশনের/ট্রেনিং এর কারণ :

১. ভারতের সঙ্গে শেখ মুজিবের চুক্তি হয়েছে, আগামী কল্য (১৫-০৮-'৭৫) শেখ মুজিব নেপাল ভুটানের মতো রাজা হবে। লেঃ জামাল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হবে। বাংলাদেশ ভারতের একটি করদ রাজ্য হবে। দু-চার দিনের মধ্যে বেঙ্গল ল্যান্সার ভেঙ্গে দিবে। এ কাজ রুখতে হবে।

২. দেশ দুর্নীতিতে ভরে গেছে। সরকারী কর্মচারীরা কাজ কর্ম করে না। ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না।

ছয়. অপারেশনের লক্ষ্য :

১. বঙ্গবন্ধুকে ধরে এনে বঙ্গভবনে রাখা হবে।[৮] আর্মিরা ৩—৬ মাস দেশ শাসন করবে।

২. বঙ্গবন্ধুর সরকার ও প্রশাসনের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩. ছয় মাসের জন্য দেশে সামরিক আইন জারী করা হবে এবং তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

৪. বাকশাল ও রক্ষীবাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হবে।

৫. ভারতের সঙ্গে সকল চুক্তি বাতিল করা হবে।

সাত. যাত্রার সময় :

১. বিশেষ অপারেশনের জন্য যাত্রা শুরু হবে চারটায়।

২. শত্রু বাড়ি আক্রমণ হবে পাঁচটায় রিভিলের সময়।

আট. দায়িত্ব/কর্তব্য :

১. কনভয় কমাণ্ডার মেজর ফারুক রহমান, ট্যাংকসহ মূল দলের নেতৃত্ব। আর ভি বঙ্গবন্ধু ভবন।

২. উপ-অধিনায়ক ২ ইষ্টবেঙ্গল মিন্টো রোডস্থ মন্ত্রী আবদুর রব সের-নিয়াবতের বাড়ি।

৩. মেজর (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম ও ক্যাপ্টেন কিসমত শাহবাগস্থ ঢাকা বেতার কেন্দ্র।
৪. মেজর রশীদ, শেখ ফজলুল হক মনির বাড়ি।
৫. মেজর মহিউদ্দীন, টি এণ্ড টি ভবন।
৬. মেজর রাশেদ চৌধুরী, ঢাকা বিমান বন্দর।
৭. মেজর মোমিন, রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তর।

নয়. বিশেষ ট্রাঙ্ক ফোর্স :

মেজর শরিফুল হোসেনের নেতৃত্বে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, নায়েব রিসালদার সারোয়ার হোসেন, দফাদার নুরুজ্জামান, এলডি মারফত আলী, এলডি আবুল হাসেম প্রমুখ বিশেষ কর্তব্য পালন।[৩]

দশ. চূড়ান্ত ব্রিফিং :

ঢাকা বেতার কেন্দ্র (শাহবাগ) সকাল ৬টা।

এগার. ক্ষমতা দখল :

বাহিনী প্রধানদের আনুগত্য প্রদান ইত্যাদির দায়িত্বে মেজর রশীদ, মেজর ডালিম, তাহের উদ্দিন ঠাকুর।

বার. তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের ধর পাকর কঠোর হস্তে করা হবে। প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে সঙ্গে খতম করতে হবে।

* অভ্যুত্থানকারীদের এটা ছিল সাধারণ লক্ষ্য। মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করা। কিন্তু ইহা জেনারেল জিয়া, মিঃ বোস্টার, মেজর চক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে এটা জানলে অভ্যুত্থানকারী সৈন্যরা অংশগ্রহণ করতো না।[২]

০ এই দলের লোকগুলোকে নেশা করান হয়। তারা সে সময় স্বাভাবিক ছিল না।[২]

০০ সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা এবং অপপ্রচার চালানোর জন্য জেনারেল জিয়া বিভিন্ন স্তরে কাজ শুরু করেন। অফিসারদের মধ্যে ব্যক্তিগত কাজ করার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে অনুগত এমন কিছু অফিসারকে নিয়োগ করেন। অনুরূপভাবে জেসিও, এনসিও এবং সৈনিকদের মধ্যে কাজ করার জন্য কয়েকজন জেসিওকে নিয়োগ করেন। সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে মীর শওকত আলী, এম এ মঞ্জুর এবং নুরুল ইসলাম শিশু তার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন।[১২]

পনেরই আগষ্ট অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য

১৯৭৫ সালের পনেরই আগষ্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে চারটি শক্তির যোগসূত্র ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল :

এক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা সি আই এ-এর লক্ষ্য ছিল :

১. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে আমেরিকার পরাজয় ঘটে। সে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়া।
২. বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি কার্যকর হতে না দেয়া।
৩. বাংলাদেশকে শক্তিশালী হতে না দেয়া।

দুই. ভারত সরকারের লক্ষ্য :

১. স্বাধীন বাংলাদেশে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় থাকবে এটা ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তাদের স্বপ্নভঙ্গ করে। তাই বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতাকে দৃশ্য থেকে সরাবার জন্য "র" কৌশল অবলম্বন করে।
২. বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে মজবুত হতে না দেয়া।
৩. বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হতে না দেয়া।
৪. পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী হিসাবে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে না দেয়া।

তিন. পাকিস্তানের লক্ষ্য :

১. একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়া।
২. একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে সহযোগিতা করা।
৩. বাংলাদেশের সঙ্গে কনফেডারেশনের মতো একটি সম্পর্ক স্থাপন করা।

(উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার তিরোধান আবশ্যকীয় বলে পাকিস্তান শাসকবর্গ মনে করেছিলেন)

১. জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের লক্ষ্য :

(ক) ছলেবলে কৌশলে মুজিব সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করা।

(খ) ইন্দোনেশিয়ার মত সামরিক প্রভাবিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

(গ) নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র কায়েম করা।

(ঘ) ব্যাংক, বীমা, কল কারখানা থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাদ দিয়ে দক্ষ লোক নিয়োগ করা।

২. খুনী মোশতাক পক্ষের নেতৃত্বে মৌলবাদীদের লক্ষ্য :

(ক) ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্থলে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) পাকিস্তানের সঙ্গে কনফিডারেশন গঠন করা।

(গ) সমাজতন্ত্রের স্থলে পুজিবাদ প্রতিষ্ঠা করা।

(ঘ) কোটা সিষ্টেম রহিত করা।

(ঙ) আওয়ামী লীগপন্থীদের স্থলে সর্বক্ষেত্রে কট্টর ধর্মান্ধদের প্রতিষ্ঠা করা।

আগষ্ট অভ্যুত্থানকারীদের প্রচার কৌশল

প্রচারণা :

১. তিন/ছয় মাসের জন্য সারাদেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান সরকার ভেঙ্গে দিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানদের উপ-সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা।

২. বাকশাল পদ্ধতি বাতিল করা। রক্ষীবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে পুলিশে আত্মীকরণ করা। রক্ষীবাহিনীর অস্ত্র সেনাবাহিনীকে দেয়া।

৩. ভারতের সঙ্গে সকল প্রকার চুক্তি বাতিল করা।

৪. তিন মাসের মধ্যে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা এবং সংসদীয় পদ্ধতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা।

৫. প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করা, দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীসহ অফিসার ও চোরাচালানীদের বিচার করে দোষী ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে গুলি করা।

৬. শেখ কামাল ও শেখ নাসেরকে হত্যা করা। বঙ্গবন্ধুকে ফিল্ড আর্টিলারী অথবা বঙ্গভবনে রেখে দেশের শাসন কাজ পরিচালনা করা।

৭. একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষাবাহিনী গঠন করা, তিন বাহিনীর বেতন স্কেলের সমন্বয় করা। ভারত থেকে একাত্তরের অস্ত্রের অংশ ফেরত আনা।

৮. মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। ভুয়া মুক্তিদের নাম প্রকাশ করা।

৯. বিডিআরকে শক্তিশালী করা এবং এ জন্যে বিডিআর এ কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়োগ করা।

উল্লিখিত বিষয়গুলি শুনে সৈন্যরা আনন্দ উল্লাসে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করত। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে এমন কথা কখনো বলে নাই। বঙ্গবন্ধুর চার পাশের লোকেরা খারাপ। তাকে ভুল পরামর্শ দেয়। আসল ঘটনা জানতে দেয় না। বঙ্গবন্ধুর আত্মীয় স্বজনেরা কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে এবং বিদেশী ব্যাংকে জমা করে রাখছে। এ সব প্রচারণায় দেশী বিদেশী সংবাদ মাধ্যমগুলি অভ্যুত্থানকারীদের অনুকূলে ব্যাপকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে!

অভ্যুত্থানকারীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল :

১. প্রথম আক্রমণেই বঙ্গবন্ধুসহ তার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজন এবং মন্ত্রীবর্গ যারা সহযোগিতা করবে না তাদের হত্যা করা।

২. স্বল্প সময়ের জন্য মোশতাককে রাষ্ট্রপতি ও জনাব তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা।
৩. দেশে সামরিক আইন বলবত করা।
৪. বাকশাল বাতিল করা।
৫. মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত সকল প্রকার প্রচারণা বন্ধ করা।
৬. বঙ্গবন্ধুর নাম বিষয়ে সর্ব প্রকার প্রচার নিষিদ্ধ করা।
৭. অভ্যুত্থান সমর্থকদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করা।
৮. অভ্যুত্থান স্বপক্ষে ব্যাপক প্রচার করা।
৯. তিন মাসের মধ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা দখল করা।
১০. জরুরী ভিত্তিতে কতিপয় উন্নয়নমূলক কাজ করা।
১১. কতিপয় সেনা ইউনিট খাড়া করান এবং সৈন্যদের পদোন্নতিসহ কতিপয় আর্থিক সুবিধা প্রদান করা।
১২. পাশ্চাত্য ও আরব বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করা।
১৩. মধ্যপ্রাচ্যসহ বিদেশে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করা।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পট পরিবর্তনের কারণ

বিএনপি সরকারের প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা বলেছেন যে পনেরই আগষ্টের পরিবর্তন ছিল এ দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এর সপক্ষে তিনি যে সব কারণ দেখিয়েছেন, সেগুলো হলো :

১. মুজিব সরকারের অগ—শাসন, দুঃশাসন ও অত্যাচার।
২. রক্ষীবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়ণ।
৩. বহুদলীয় গণতন্ত্রকে নসাৎ করে স্বৈরাচারী এক দলীয় বাকশাল প্রবর্তন করা।
৪. সংবাদপত্রের কণ্ঠোরোধ।
৫. নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে গগণচুম্বী মূল্যবৃদ্ধি।
৬. রিলিফের অবাধ চুরি।
৭. গাড়ি হাইজ্যাকিং ব্যাংকলুট, চোরাকারবারী, মজুতদারী।
৮. ১৯৭৪ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।
৯. বাংলাদেশ ভারত ২৫ বছরের মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়া।[১৩]

উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়াও আগষ্ট পরিবর্তনের পক্ষে তারা যেসব কারণ বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেন সেগুলো হল :

১০. চোরাকারবারী, মজুতদারী এবং সম্পদ পাচারকারী।
১১. জরুরী অবস্থা আইন ১৯৭৩ (২২শে সেপ্টেম্বর)।
১২. ১৯৭৩ সালের ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্স।
১৩. ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে কারচুপি করা।
১৪. সিরাজ শিকদারের মৃত্যু।
১৫. ব্যাংক, বীমা, কল কারখানায় দক্ষ লোক নিয়োগ না করা।
১৬. বেতন বৈষম্য।
১৭. ভারতবিরোধী প্রচারণা।

পনেরই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার দিনটি হত্যাকারীরা, পট পরিবর্তন, নাজাত দিবস, দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবস, গণতন্ত্র রক্ষা দিবস, বিজয় দিবস বলে আখ্যায়িত করেন। কেউবা মুজিব সরকারের ব্যর্থতা দিবস বলেন। আওয়ামী লীগ সহ স্বাধীনতা পক্ষের শক্তিগুলি এ দিনকে—গণতন্ত্র হত্যা দিবস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস দিবস, বাঙ্গালির কালো দিবস ইত্যাদি বলে থাকেন। যাই হোক, পনেরই আগষ্ট হত্যা তথা পট পরিবর্তন সংক্রান্ত কারণগুলি নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো :

এক. অপ-শাসন :

বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের শাসনকালকে অভ্যুত্থানকারীরা অপ-শাসন কাল বলে প্রচার করেছিলেন। একটি সদ্য স্বাধীন দেশে শাসন ব্যবস্থা একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়। এই প্রশাসন গঠন জটিলতাকে সরকার বিরোধীরা অপ-শাসন বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছেন, কারণ :

১. কেন্দ্রীয় প্রশাসনে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা কর্মচারীরা মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন এবং স্বাধীনতার পর তারা সেখানে আড়াই বছর আটক ছিলেন।

২. প্রাদেশিক প্রশাসনে, কল-কারখানা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বেশির ভাগ কর্মকর্তা কর্মচারীরা ছিলেন অবাঙালি। স্বাধীনতার পর, তারা পাকিস্তানে চলে যায় অথবা যাবার জন্য জেনেভা ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে প্রাদেশিক প্রশাসন, কল-কারখানা ইত্যাদি শূন্য হয়ে যায়। এদের পূরণের জন্য তখন দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ সমস্যাজনক হয়ে যায়। কারণ দক্ষ ও অভিজ্ঞ বাঙালি কর্মচারী ছিল না।

৩. বাংলাদেশ পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো অফিসই ছিল না। ফলে একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে বৈদেশিক অফিসসহ সকল অফিস নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এক দিকে অফিস ঘর যেমন প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তেমনি জনবল নিয়োগ করতে হয়। এক সঙ্গে তখন এ জাতীয় প্রশাসন গঠন খুবই ব্যয় বহুল ছিল।

৪. (ক) মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বল্পসংখ্যক বাঙালি কর্মচারী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগদান করেন।

(খ) বেশির ভাগ বাঙালি কর্মকর্তা কর্মচারীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে।

(গ) কিছু কিছু কর্মচারী দেশের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন।

(ঘ) কেউ কেউ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পাক সরকারকে সাহায্য সহযোগিতা করেন।

উল্লিখিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনে নিয়োগ করা সহজ ছিল না। এদের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করতে সময় লাগে। পাকিস্তানপন্থীদের ছাঁটাই করে সুযোগ প্রদানে বিলম্বিত হচ্ছিল।

৫. উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা উত্তর শূন্য প্রশাসন সংগঠন করতে বিলম্ব ঘটে। অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারীদের দ্বারা সরকারকে প্রশাসন চালাতে হয়। আটকে পরা বাঙালি কর্মচারীরা পাকিস্তান থেকে আসলে নিয়োগ করা হবে তাই বেশি করে নূতন লোক নিয়োগ করাও সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে ১৯৭১ '৭২ '৭৩ সাল পর্যন্ত বলতে গেলে বাংলাদেশে

কোনো প্রশাসনই ছিল না। স্বল্প সংখ্যক কর্মচারীদের দ্বারা দেশ পরিচালনা করতে হয়েছে।

৬. বাংলাদেশে অবস্থানকৃত বাঙালি কর্মচারীদের অবস্থা তদন্ত সাপেক্ষে নিয়োগ করা হয় ১৯৭৪ সালের দিকে। আবার পাকিস্তান ফেরত কর্মচারীরাও ফিরে বিভিন্ন অফিসে যোগদান করেন ১৯৭৪ সালে। স্বাধীনতা—উত্তর এই নড়বড়ে প্রশাসন দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দেশ পরিচালনা করতে হয়েছে। এই হাঁটি হাঁটি প্রশাসনকে, ভাল মজবুত, গতিশীল বলা যায় না আবার দুর্বল নড়বড়ে প্রশাসনের নিকট ভাল ফলাফল আশা করা যায় না। কিন্তু তাই বলে এটাকে অপশাসনও বলা যায় না।

৭. স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে সেনাবাহিনীর কতিপয় কমাণ্ডার ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা শুরু করে। তারা বেসামরিক কতিপয় আমলাদেরও রাজনৈতিক নেতাদের সহিত আঁতাত করে। ফলে এরাও প্রশাসন গঠনে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি করে।

৮. এ সময় মুজিব শাসনকাল মূল্যায়ন করে কতিপয় সাংবাদিক, লেখক, যেমন এনায়েতুল্লাহ খান, মওদুদ আহমেদ, আহমদ ছফা, আহমদ শরীফ, বদরউদ্দিন ওমর, আলী রিয়াজ, আহমদ মুসা, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন প্রমুখ পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করেন। তারা প্রশাসন গঠনে এবং মুজিব শাসনকালকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন। এটা ইচ্ছাকৃতও হতে পারে অথবা প্রশাসন সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণার অভাবেও হতে পারে। বঙ্গবন্ধু নড়বড়ে প্রশাসন দিয়ে তখন যেভাবে দেশ শাসন করেছিলেন, বাইশ বছর পরে তা চিন্তা করলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। যারা তার শাসনকালকে অপ-শাসন বলেন তারা হয় জ্ঞান পাপী নয়তো বাংলাদেশ এবং বাঙালির শত্রু।

দুই. রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচারণা :

তালিকাভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চাকুরীজীবী, পেশাজীবী এবং ছাত্র বাদে বাকি মুক্তি যোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য তদানীন্তন সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ, বিডিআর এ ভর্তির পর যারা থাকবে তাদের রক্ষী বাহিনীতে ভর্তি করা হবে। তদনুসারে, মুজিববাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও কাদেরিয়া বাহিনী থেকে কয়েক হাজার সদস্য নির্বাচন পূর্বক ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়।[৩] এটার দুটি শাখা ছিল, (ক) লাল বাহিনী বা সেচ্ছাসেবী বাহিনীর ন্যায় আধা-সরকারী বাহিনী (খ) প্যারা মিলিটারি সংস্থা—জাতীয় রক্ষীবাহিনী।[৪]

রক্ষীবাহিনী যখন গঠিত হয় তখন পুলিশ বিডিআর পুনর্গঠিত হয় নাই। পুনর্গঠনের কাজ চলছিল। একই সাথে প্রতিরক্ষা বাহিনীরও পুনর্গঠন চলছিল। কিন্তু প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠনের জন্য আর্থিক সংকট প্রকট ছিল, তখন বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের স্বীকৃতি লাভ সম্ভব হয় নাই এবং বৈদেশিক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন হয় নাই। অথচ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ ছিল। সরকারী নির্দেশে মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী ও কাদেরিয়া বাহিনীর যোদ্ধারা অস্ত্র জমা দিলেও মুক্তিযোদ্ধাদের জাসদ পন্থীরা বামপন্থী যোদ্ধারা অস্ত্র জমা দেয় নাই। এরা স্বাধীনতাবিরোধীদের পক্ষ নেয় এবং সর্বহারা পার্টির সদস্যদের সঙ্গে মিলে প্রকাশ্যে গণবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়। পুলিশ, বিডিআর-এর অবর্তমানে সারাদেশে নিরাপত্তা-হীনতা এবং বিশৃংখলতা বিরাজমান ছিল। এমতাবস্থায় রক্ষীবাহিনী গঠন এবং বন্ধু রাষ্ট্রের সহযোগিতায় জরুরীভাবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, সময়োপযোগী ছিল। জাতীয় নিরাপত্তা এবং বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার ও ভুয়া রেশন কার্ড উদ্ধার কাজে রক্ষীরা গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করেছিল। দুই একটা ঘটনা বাদে এই বাহিনী তখনকার বিরাজমান পরিস্থিতিতে যে মহান দায়িত্ব পালন করেছিল তার প্রেক্ষিতেই, মাওপন্থী সর্বহারা পার্টি এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের দ্বারা দেশে তখন গৃহযুদ্ধ হতে পারে নাই। কিন্তু রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যে অপপ্রচার হয়েছে তা পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। সরকার বিরোধীরা মূলত, স্বাধীনতা বিরোধী, বিপথগামী জামাত এবং সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠি ছিল। এরা জাতীয় স্বার্থের চেয়ে ক্ষমতা দখল বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিল এবং সে জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে রক্ষীবাহিনীর ভাবমূর্তি কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা নষ্ট করেছে।[১০]

তাদের অপ-প্রচার :

১. রক্ষীবাহিনী শেখ মুজিবের গোপন প্রাইভেট বাহিনী, ভারতীয় স্বার্থে গঠন করা হয়েছে।

২. রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা এক লক্ষ হয়েছে।

৩. রক্ষীবাহিনী উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যেমন, ট্যাংক, কামান, গ্রেনেড ইত্যাদি।

৪. সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে রক্ষীবাহিনী রাখা হবে।

৫. রক্ষীবাহিনীর ক্ষমতা বেশি এবং তাদের বেতনও বেশি।

(ক) পঁচাত্তর—উত্তর প্রমাণিত হয় যে রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা বার হাজার, তাদের ট্যাংক, কামান ছিল না এবং তারা সামরিক বাহিনীর বিকল্প ছিল না।[৮]

(খ) রক্ষীবাহিনীর গঠন একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল, তাই এর গোপনীয়তা কিছুই ছিল না।

(গ) রক্ষীবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত বেসামরিক নিরাপত্তা বাহিনী ছিল। আইন শৃংখলার প্রয়োজনে তাদের নিয়োগ ব্যবস্থা ছিল। পুলিশবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য এ জাতীয় বাহিনী পৃথিবীর বহুদেশে বিদ্যমান।[১১] এটা কোনো প্রাইভেট বাহিনী ছিল না।

(ঘ) রক্ষীবাহিনীর অবকাঠামো খুবই নিম্নমানের ছিল, এটার পরিচালক, সেনাবাহিনীর একজন কর্ণেল মর্যাদা সমান এবং সেনাবাহিনী থেকে পেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। এ-বাহিনীর দুজন মাত্র সহকারী পরিচালক লেঃ কর্ণেল পদমর্যাদার ছিলেন। তাই এর মান সেনাবাহিনীর কেন পুলিশের মতও ছিল না।

বিরোধীদের অপ-প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল :

(ক) রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সুকৌশলে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অপ-বাদ।

(খ) রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে জনমনে ভীতি ও বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা।

(গ) সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলা।

(ঘ) সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করা। আইন শৃংখলার অবনতি ঘটান এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় দেশের অমঙ্গল হয়েছে এটা প্রমাণ করা। মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবস্থানকে ন্যায় বলে প্রতিষ্ঠিত করা।

তিন, বহুদলীয় গণতন্ত্রকে নসাৎ করে স্বৈরাচারী একদলীয় বাকশাল, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ প্রবর্তন করা :

বাকশাল গঠিত হয় ২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ট ভোটে। এর উদ্দেশ্য ছিল :

(ক) স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা,

(খ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা,

(গ) দুর্নীতি উচ্ছেদ করা, এবং

(ঘ) বাঙ্গালী জাতির ঐক্য সুদৃঢ় করা।

বাকশালের কার্যকরী ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ হতে শুরু হবার কথা ছিল। এটা ছিল প্রেসিডেন্টশিয়াল পদ্ধতি। বাকশালের সংগঠনিক কাঠামো ছিল :

(ক) শ্রমিক, (খ) কৃষক, (গ) যুবক (ঘ) ছাত্র ও (ঙ) মহিলা।

প্রশাসন ঃ সারা দেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করে প্রতিটি জেলায় একজন গভর্নর (প্রশাসক) যিনি বাকশালের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন। জেলা কাউন্সিলের ন্যায় থানা কাউন্সিল থাকবে। থানার কর্মকর্তা হবেন থানা প্রশাসক। বাকশাল গঠন সম্পর্কে স্বনামধন্য জনাব আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী বলেন, "বাকশাল একটি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল। এটা একটি ডাহা মিথ্যা প্রচারণা। বাকশাল আসলে ছিল একটি বহুদলীয় প্লাটফরম এবং গণঐক্য জোটেরই পরবর্তী পদক্ষেপ। ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী বিপ্লবী চক্রান্ত অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান, সউদী আরব ও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে তাদের চর ও এজেন্টদের মারফত বাংলাদেশে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করার চেষ্টা জোরদার করে। আমেরিকা বাংলাদেশের নয় মাসের যুদ্ধবিধ্বস্ত আর্থিক-ব্যবস্থাকে স্যাবোটাজ করার গোপন অপচেষ্টা বাড়িয়ে দেয় এবং আমি ব্যুরোক্র্যাসি ছাড়াও সিভিল বারোক্র্যাসিকে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে শেখ মুজিব, তার পরিবার ও তার মন্ত্রীসভার সদস্যদের চরিত্র হননের প্রচারণা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া হয়। চিলির আলেন্দে সরকারকে উৎখাত করার আগে, আমেরিকান সি আই এ যেমন চিলিতে অর্থনৈতিক স্যাবোটাজ, শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি এবং আন্দোলনকে লাল দানব আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অসত্য ও অতি প্রচারণা শুরু করেছিল ঠিক একই কায়দায় বাংলাদেশের মুজিব সরকারের পতন ঘটানোর চক্রান্ত শুরু করে। এই মুজিববিরোধী চক্রান্তে বাংলাদেশের এলিট রায়ের কিছু বামপন্থী ব্যক্তি এবং পেশাজীবি সাংবাদিক ও মথেষ্ট সাহায্য করে। তাদের মধ্যে আতিকুল আলম, এনায়েতুল্লাহ খানের নাম বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করা চলে। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে ফিরে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এদের কার্যকলাপ জানা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন। ব্যারিষ্টার মওদুদ, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন ও আনোয়ার হোসেন প্রমুখের মতো ব্যক্তিদের কার্যকলাপ নিয়ে মহাভারত রচনা করা চলে।[১০] জনাব রুহুল কুদ্দুস বলেছেন যে, দেশের সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী আমলারা বাকশাল প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ দেন এবং ইহা স্বল্প সময়ের জন্য একটি জরুরী কার্যব্যবস্থা ছিল।[১১] তবে এই পদ্ধতিটি দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার না করে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাশ হলেও তা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ গ্রহণ করতে পারে নাই। তবে বাকশাল ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু ইহাকে বাস্তবায়নের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি থেকে ২১শে জুলাই পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সংবেদনশীল ইস্যুগুলোতে হাত দিয়ে বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ

দিয়েছিলেন। দেশের মৌলিক বিষয়গুলি চিহ্নিত করেছিলেন। বৃটিশ কলোনীয়ান শাসনব্যবস্থাকে ভেঙ্গে একটি বৈপ্লবিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো উপস্থাপন করেছিলেন। এতে আমলারা এবং তার দলীয় স্বার্থবাদীদের স্বার্থে আঘাত হানে, কিন্তু দেশের জনগণ, শ্রমিক, কর্মচারীগণ বুঝতে সক্ষম হয়, এবং এ জন্যই এ সময় কোথাও কোনো প্রতিরোধ ছিল না, বিক্ষোভ ছিল না। প্রতিবাদ ছিল না। ২৬শে মার্চ রমনা মাঠে যখন তিনি বললেন, দুর্নীতিতে দেশ ছেয়ে গেছে, এই আমার চার পাশে যারা বসে আছেন, তারাও এর মধ্যে পড়েন। আর এ জন্যই আমি নূতন পদ্ধতিতে যাচ্ছি। দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতেই হবে, আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু তার দলকে নয় সারা দেশবাসীকে তাঁর কর্মসূচীতে সাহায্য করার আহ্বান জানান। আমলা দালাল দুর্নীতিবাজ এবং তার সহকর্মীরা সবাই তাঁর ভাষণ শুনে স্তম্ভিত, বিস্মিত, বিচলিত এবং দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। পুরা জাতির সামনে তাদের এভাবে সনাক্ত করে দিবেন এটা তারা ভাবতে পারেন নাই। দেশবাসী এটাই কামনা করেছিলেন। বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁর নতুন দলে স্বতস্ফূর্তভাবে যোগদান শুরু করে। এসব দেখে স্বার্থবাদী গোষ্ঠী, আমলা এবং ক্ষমতালোভী সেনাচক্র যারা দীর্ঘদিন থেকে ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারায় ছিলো, তারা ভীষণভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে, নতুন শাসনব্যবস্থা একবার যদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তাহলে আর তারা ক্যু করে উঠতে পারবেন না। তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্যে দ্রুততার সঙ্গে নতুন পদ্ধতি কার্যকরী করার পনের দিন পূর্বেই বাংলার এবং বাঙ্গালি জাতির কলঙ্কিত হত্যাকাণ্ডটি ঘটায়, এবং এটার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দেশ ও জাতির কোনো মঙ্গলই হয় নি।

চার. সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ :

স্বাধীনতা-উত্তর দেশের সংবাদপত্রগুলো সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতার সুযোগে দলগত স্বার্থে পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে যায়। ভিত্তিহীন রূপকতথ্য প্রকাশ করতে থাকে। দেশের স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থ, অর্থ উপার্জন তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। সংবাদপত্র যেন মাছের বাজার। সবগুলি পত্রিকা নীতিহীন হয়ে পড়ে। ইত্তেফাকের মতো ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাও সি আই এ-এর এজেন্ট হয়ে যায়। সাধারণ লোকজনও বিভ্রান্ত এবং বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে। কতিপয় রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং সাংবাদিকদের ভূমিকা ছিল দায়িত্বহীন ও ক্ষতিকর। ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দল আর পত্রিকার প্রতি জনগণ বীতশ্রদ্ধ হয়ে এগুলি বন্ধ করে দেবার দাবী তোলে। এমতাবস্থায় একটা ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবেই সাংবাদিক এনায়েতুল্লাহ খান সব সংবাদ-

পত্র বন্ধ করে স্বল্প কিছু রাখার সুপারিশ করেন। তার প্রভাব এবং সাংবাদিকদের লাগামহীন উচ্ছৃংখলতা এবং প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু সরকার ষড়যন্ত্রের দাবানলে পড়ে যায়। ১৬ই জুন ১৯৭৫ সরকার সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা আদেশ জারী করেন। উক্ত আদেশ বলে ৪টি দৈনিক পত্রিকা ও ১২৪টি সাময়িকী ব্যতীত দেশের অন্যান্য সকল পত্রিকার ডিকলারেশন বাতিল ঘোষণা করেন এবং একই সঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস সরকারী মালিকানাধীন করেন।[৩] দায়িত্বহীন, নীতিহীন, ক্ষতিকর এসব পত্রিকা বন্ধ হওয়ায়, দেশের সাধারণ পাঠককুল খুশি ও আনন্দিত হয়। অধিকাংশ সাংবাদিক এটাকে সমর্থন করলেও স্বার্থবাদীরা ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে হাত মিলায়। উল্লেখ্য যে সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা আদেশের বিরুদ্ধে তখন কোনো প্রতিবাদ কিংবা প্রতিরোধ হয় নাই।

পাঁচ. নিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের গগনচুম্বী মূল্য বৃদ্ধি :

১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর আরবরা তাদের তেলকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের জন্য তেলের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করে। এর ফলে :

১. বিশ্ব মুদ্রা তহবিলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

২. সারা বিশ্বে মুদ্রাস্ফিতি দেখা দেয়। বাংলাদেশে যেহেতু পূর্ব থেকেই কোনো বৈদেশিক মুদ্রা মজুত ছিল না তাই দারুণভাবে আঘাত হানে। জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রকৃত কারণ না বলে, না লিখে স্বাধীনতাবিরোধীরা এবং সরকারবিরোধী শক্তিগুলো প্রচার করতে থাকে যে, সরকার ব্যর্থ হওয়ায় এ অবস্থা। মৌলবাদী দলগুলো প্রচার করে যে, দেশ স্বাধীন হবার ফলেই এ অবস্থা। পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনকারী কর্মচারী সৈন্যরা দুই বছর পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যাম্পে আটক ছিলেন। তাদের আটক অবস্থায় বিশ্বজুড়ে ঘটে মুদ্রাস্ফিতির ঘটনা। তারা দেশে ফিরে সত্য ঘটনা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। তারাও সরকারবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অথচ উন্নত বিশ্বসহ সকল দেশের দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি উদাহরণ : আর্জেন্টিনায় সকল ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় ১১ গুণ ; (খ) চিলিতে২৬ গুণ ; (গ) কোরিয়াতে ৩ গুণ ; (ঘ) ব্রিটেনে দ্বিগুণ।

খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পায় নিম্নহারে :

১. আর্জেন্টিনায় ১০ গুণ চিলিতে ৩০ গুণ কোরিয়ায় ৩ গুণ ব্রিটেনে দ্বিগুণ।

২. ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববাজারে গমের দাম ১৯৭২ সালের তুলায় চারগুণ বৃদ্ধি পায়।

৩. থাইল্যাণ্ডে চালের দাম ১৯৭১ সালের তুলনায় প্রতিটন ১৩০ ডলারের তুলনায় ১৯৭৪ সালে প্রতিটনে ৩০০ ডলার বৃদ্ধি পায়।

উল্লিখিত অবস্থায় ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশেও ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় মোটা সিদ্ধ চাল জুলাই মাসে প্রতি সের ৪ টাকা, অক্টোবর মাসে ৭ টাকা। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসে এই মূল্য কমে ৬ টাকা, আগষ্ট মাসে ৩·৭৫ টাকা। ৬ মাসে সব জিনিষের দাম গড় মূল্যে হ্রাস পায় ৪০%। এই মূল্য হ্রাসের কারণ ছিল, তখন বিদেশ থেকে আমদানীকৃত জিনিষসমূহ দেশে আসতে শুরু করেছে এবং দেশে সে বছর বামপার ফসল উৎপন্ন হয়েছিল।[১৩] তখন মোটামুটিভাবে দ্রব্যমূল্যের দাম স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল।

স্বাধীনতা উত্তর জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির কারণ :

১. মুক্তিযুদ্ধের ফলে দেশের কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়।

২. আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের চুক্তিবদ্ধ হয়ে যায় এবং বাংলাদেশ সরকার নূতনভাবে তাদের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে না পারায় বিদেশ থেকে জিনিষপত্র আমদানি করতে না পারায় বাজারে জিনিষপত্রের সরবরাহ নিঃশেষ হয়ে যায়।

৩. ১৯৭২ সালে দেশে অস্বাভাবিক খরার জন্য কৃষি উৎপাদনের ঘাটতি হয়।

৪. ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশে ভয়ানক বন্যার ফলে হাজার হাজার লোক বিশেষ করে নদ-নদীর পাড়ের লোকদের ঘর বাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এবং বন্যার ফলে দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

৫. মার্কিন সরকারের প্রতিশ্রুত খাদ্য সরবরাহ না করা।

৬. আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরিণামস্বরূপ বিশ্ববাজারে মুদ্রাস্ফিতির ছোবলে বাংলাদেশেও মুদ্রাস্ফিতি হয়।

৭. খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন জিনিষের আমদানি বিপর্যয় হেতু দেশে জিনিষপত্রের সরবরাহের অপ্রতুলতা।

৮. যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে কল-কারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষতি সাধন হেতু এসব কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ থাকায় জিনিষপত্রের সরবরাহ না থাকা।

৯. প্রশাসনের দুর্বলতায় চোরাচালানীরা অতিকষ্টে সীমিত পরিমাণে আমদানিকৃত জিনিষপত্র সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত বার্মা পাচার করত।

এই চোরাকারবারীরা সমাজের সর্বস্তরের লোক ছিল। তাদের প্রতিহত না করে সরকারবিরোধীরা তাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন কেবলমাত্র মুজিব সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য।

ছয়. রিলিফের অবাধ চুরি :

সদ্য স্বাধীন ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের চাহিদার চেয়ে বিশ্ব সংস্থা থেকে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া গেছে খুবই কম। ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের চাহিদার পরিমাণ না জেনে এক শ্রেণীর লোক বলতেন, তাদের অনেক সাহায্য দেয়া হয়েছে। সরকারবিরোধী শক্তিগুলির মিথ্যা প্রচারণায় তারাও বিভ্রান্ত হয় এবং সত্য বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণ : একজন চেয়ারম্যান, একটি গ্রামে এক শত ঢেউ টিন বিলি করার সময় দুই শিট টিন উক্ত গ্রামের অথবা পাশের গ্রামের স্কুলের জন্য দিলেন। অপবাদকারীরা এটাকেই চুরি বলে প্রচার করলেন। তখনকার অবস্থার প্রেক্ষিতে এভাবে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ না করলে স্থানীয় সমস্যা সমাধান খুব দুষ্কর ছিল। তখন সকলেরই অর্থসংকট। একটি ধ্বংস প্রাপ্ত স্কুল ঘরকে চাল দিতে না পারলে সেটা চালু করা সম্ভব হচ্ছিল না। ধরুন, একটি ইউনিয়নে ৬ হাজার পরিবার আছে তার মধ্যে ১২০০ গরীব। অনুদান শাড়ি পাওয়া গেছে ৭০০। ৭০০ পরিবারকে দেয়া হয়েছে। যারা একটি করে পেয়েছে, তারা তখন দাবী করেছে, আমাদের ২টি করে মঞ্জুর হয়েছে, চেয়ারম্যান তাদের একটি করে দিয়েছে। যারা পায় নাই, তাদের অনেকে বলেছে আমাদের শাড়ি চেয়ারম্যান মেম্বার মিলে বিক্রী করে দিয়েছে। অনেকে রিলিফের জিনিষ পছন্দ করতেন না। আবার অনেকে অভাবের তাড়নায় সেটা বিক্রী করে দিতেন। বাজারে সেইসব জিনিষ দেখে এক ধরনের লোক প্রচার করতেন যে রিলিফের জিনিষে বাজার ভরে গেছে। আর এ জন্য দোষারোপ করা হত চেয়ারম্যান মেম্বারদের তথা সরকারের। সত্য ঘটনা জানবার প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুধাবন করতো না।

সাত. গাড়ি হাইজাকিং, লুট, চুরি ডাকাতির অভিযোগ :

আগেই বলেছি তখন দেশে দারুণ অর্থ সংকট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বিরাজমান ছিল। রাজাকার, চীনা পন্থী বাম রাজনৈতিক দল এবং সর্বহারাদের নিকট শত শত অস্ত্র। সরকার বিরোধীতার নামে এসব অস্ত্রধারীরা সারা দেশে ত্রাসের সৃষ্টি করে। থানা লুট, হাইজাকিং, ব্যাংক লুট, চুরি ডাকাতি তাদের নিত্যদিনের কর্ম। এরা এসব করে সরকারের উপর দোষ চাপায়। আর এদের দলীয় পত্রিকা সমূহ তাদের সমর্থনে মিথ্যা বায়োনাট প্রচারণা চালায়। শত শত লোককে এরা হত্যা করে রক্ষী বাহিনীর নামে প্রচারণা চালিয়েছে।

একটা উদাহরণ : এরশাদ আমলের একজন মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী জাসদ গণবাহিনীর অন্যতম কমাণ্ডার ছিলেন। তার বাহিনী, থানা লুট, বাজার ঘেরাও করে লুটপাট করে। অসংখ্য চুরি ডাকাতির হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার অধীনের বাহিনী দ্বারা প্রায় উত্তরবঙ্গের এক চতুর্থাংশ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার বলে আওয়ামী লীগ সরকার তাকে ধরে নাই। জিয়াউর রহমান তাকে ধরে নাই, তবে তার দলে যোগ দেবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নিজ দলের লোকেরা তাকে মেরে ফেলতে পারে ভয়ে যোগ দেন নাই। কিন্তু জিয়াউর রহমানকে সকল প্রকার সহযোগিতা করেছেন, বিনিময়ে টাকা পয়সা ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদির মালিক হয়েছেন, পরে জাসদ ভেঙ্গে গেলে তিনি এরশাদের দলে যোগ দেন, মন্ত্রী হন। এখন তিনি শাসককূলের বাসিন্দা। তার মতোই শত শত মুক্তিযোদ্ধা কাম গণবাহিনী কাম বিপ্লবী গণবাহিনী এবং পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি, বামপন্থীদের আণ্ডার গ্রাউণ্ড সশস্ত্র ক্যাডার, রাজাকারবাহিনী গুপ্তহত্যা চালিয়েছে— মুজিব সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য নিজেরা ক্ষমতা দখলের জন্য গুলশান বনানী, বারিধারার বাসিন্দা হবার জন্য কোটিপতি শ্বশুর হবার জন্য বোম্বে ইংলাণ্ড নিউইয়র্ক বাড়ি কেনার জন্য। বাংলাদেশ কিংবা বাংলার জনগণের জন্যে নয়।

মুজিব আমলে কত গাড়ি চুরি হয়েছে, ডাকাতি হয়েছে, খুন হয়েছে আর এখন কত হচ্ছে এর একটা পরিসংখ্যান করলেই বুঝতে পারা যাবে।

আট. ১৯৭৪ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ :

স্বাধীনতা উত্তর বিবিসির একটি প্রতিবেদনে শুনেছিলাম যে, বাংলাদেশে (ক) খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব নয়। (খ) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্ভব নয় এবং (গ) সামরিক অভ্যুত্থান ঠেকানো সম্ভব নয়।

বিবিসি সেদিন বিষয়গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করেছিলেন। ১৯৭১ হতে ১৯৭৩ পর্যন্ত বিবিসির উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্ভব ছিল না। কিন্তু নব্বই এর গণজাগরণের ফলে বলতে গেলে বিষয় তিনটির সমাধান সম্ভব হয়েছে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের কারণ ও বিবিসি ঐ তফসরায় বিশ্লেষণ করেছিলেন ১৯৭৪ সালে ওই তিনটি বিষয়ে বাংলাদেশে সম্ভব ছিল না প্রধানত চারটি কারণে, যথা, (ক) প্রশাসনিক ব্যর্থতা, (খ) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, (গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং (ঘ) সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের পায়তারা ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র।

প্রশাসনিক ব্যর্থতা :

স্বাধীনতা উত্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই মূলত প্রশাসনিক ব্যর্থতা ঘটে, কারণ :

১. ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া :

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ এক ব্যতিক্রম ঘটনা। কারণ এভাবে স্বাধীনতা এ যুগে অচিন্তনীয়। একাত্তরে পাকিস্তান কর্তৃক ভারত বাংলাদেশ যৌথ-বাহিনীর নিকট কেবল অস্ত্র সমর্পণ করে কিন্তু তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর হয় নাই। বাংলাদেশে নিয়মাতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করতে না পারায় মারাত্মক প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হন। পাকবাহিনী চলে গেল, পড়ে থাকলো প্রশাসন। কোন প্রকার হিসাব নিকাশ বুঝা পড়া ছাড়াই এসবের কর্তৃত্ব লাভ করে বাংলাদেশ সরকার।

২. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের অভাব :

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে পাকবাহিনী পুলিশ ও ইপি আর এর শত শত লোককে হত্যা করে এ সংস্থা দুটোকে ধ্বংস করে বাঙ্গালিদের স্থলে পাকিস্তান থেকে লোক এনে নিয়োগ করে। স্বাধীনতা লগ্নে পুলিশ ও ইপি আরকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হয়। এদের পুনর্গঠন শুরু হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই সময় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এ দেশের শাসনব্যবস্থা চালু রাখে। ভারতীয়-বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা। সরকারী ডিউটি করার মতো পুলিশ ছিল না। সীমান্তে পোষ্টগুলিতে নিয়োগ করার মতো কোনো বিডিআর ছিল না। এক কথায় মুজিব শাসনকাল ছিল নিরাপত্তা সংগঠন বিহীন।

৩. খাদ্যশস্য সরবরাহ সমস্যা :

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ ছিল দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য শস্য সরবরাহ সমস্যা। তখন রাস্তাঘাট, রেলপথ, পুনঃনির্মাণ এবং মেরামতের কাজ চলছিল। এসব পথ দিয়ে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা যেমন সমস্যা ছিল তেমনি সেগুলি সরবরাহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ যানবাহনের অভাব ছিল প্রকট। স্বাধীনতা উত্তর সরকারের যানবাহন ছিল না বললেই চলে।

৪. খাদ্য গুদামজাতকরণ সমস্যা :

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে খাদ্যশস্য গুদামজাতকরণের জন্য খাদ্য গুদাম তৈরি করা হয় নাই। বলতে গেলে সবে শুরু। তেজগাঁ, ভৈরব, জামালপুর,

সান্তাহার, ঈশ্বরদীতে পাঁচটি বড় গুদাম ঘর তৈরি হচ্ছিল। জেলা, থানা, ইউনিয়ন লেবেলে খাদ্য শস্য গুদামজাতকরণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পরেই দেশে গুদাম ঘর নির্মাণের ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং সেই পরিকল্পনা মোতাবেক বর্তমানে অনেক গুদাম ঘর তৈরি হয়েছে। তখন গুদাম ঘর না থাকায় বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির পর খাদ্যাদি গুদামজাত করা সম্ভব না হওয়ায় অনেক কালো বাজারির হাতে পড়ত।

৫. অন্যান্য সমস্যা :

১৯৭১-৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারকে প্রশাসনিক অবকাঠামো খাড়া করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে হয়। যেমন : (ক) এক কোটি শরণার্থীদের দেশে পুনর্বাসন করা (খ) ষাট লক্ষ ভস্মিভূত ঘরবাড়ি তৈরি করা, (গ) হার্ডিঞ্জ ব্রিজসহ ২৯১টি রেলসেতু মেরামত, ২৭৪টি রোডসেতু পুনঃ নির্মাণ ও মেরামত, উপড়ে ফেলা রেললাইন চালু করা (ঘ) চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর চালু করা, (ঙ) সমুদ্রগামী জাহাজ ও বিমান ক্রয় করা, (চ) শূন্য তহবিলে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা করা, (ছ) ধ্বংসপ্রাপ্ত অফিস, আদালত, স্কুল কলেজ চালু করা, (জ) কলকারখানা সহ শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু করা এবং স্বাধীন দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র তৈরি করা।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :

পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বাঙ্গালিরা প্রমাণ করেছিল যে তারা একটি মাত্র রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে। অন্য কথায় তখন সত্যিকার অর্থে সরকারের বিপক্ষে বাংলাদেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল জনসমর্থন পুষ্ট ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর পরাজিত রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল। আর তারই ফলস্বরূপ তারা "সর্বদলীয় বা জাতীয় সরকার গঠনের ধুম্রজাল সৃষ্টি করে। মুক্তিযুদ্ধ যে একটি নির্বাচিত সরকারের অধীনে সংঘটিত হয়েছিল তা অস্বীকার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য এবং জনগণ ঐ সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি সমর্থন না দেওয়ায় তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওদিকে মাত্র এক বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র তৈরি হওয়ায় এবং নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু সরকার এক-চেটিয়াভাবে জয়লাভ করায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোও সরকার বিরোধী ভূমিকার পাপাপাশি স্বাধীনতা বিরোধীদের পক্ষাবলম্বন করে।

অধিকন্তু তারা সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত অস্ত্র শস্ত্র স্বাধীনতা উত্তর ঐসব রাজনৈতিক দল জমা দেয় নাই। তারা ঐ সব অস্ত্রবলে বলিয়ান হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে মদমত্ত হয়ে যায়। তারা দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধ্বংস করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। দেশ পুনর্গঠনে কোনরূপ ভূমিকা না রেখে এরা ক্ষমতার লোভে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। ফলে ১৯৭২-৭৩ সালে দেশে যে পরিমাণ স্থিতিশীলতা ছিল, '৭৪ সালে তার আরো অবনতি ঘটে। আর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সরকারও ঝড় বন্যা ও দুর্ভিক্ষসহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকে। এজন্য মুজিব সরকারকে দায়ী করা চলে না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পরিস্থিতির শিকার :

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাঙ্গালি জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা হলেও স্বাধীনতা-উত্তর বিরাজমান পরিস্থিতিতে তা দেশের জন্য এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

১. ১৯৭২ সালে বছরের অধিকাংশ সময় দেশ ঝড়ের কবলে পরে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কৃষি ও শিল্প উভয় খাতেই উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। ফলে খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর অভাব দেখা দেয়।

২. ১৯৭৩ সালে দুইবার বন্যায় দেশের ফসল হানি হয়।

৩. ১৯৭৪ সালে সারা দেশে ভয়াবহ বন্যা হয়। দেশের ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কোনো কোনো অঞ্চলে বন্যা এক মাসেরও বেশি স্থায়ী ছিল। এভাবে পরপর বছরগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন হতে পারে নাই যার জন্য ব্যাপক ভাবে খাদ্য শস্যের অভাব দেখা দেয়। তখন সরকারের পক্ষে এই সংকট মোকাবেলা করা দুরূহ হয়ে ওঠে। অধিকন্তু :

(এক) বিদেশের সঙ্গে তখন পর্যন্ত বাণিজ্যচুক্তি হতে পারে নাই, কারণ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই।

(দুই) বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য সাহায্যকারী সংস্থার সদস্য পদ লাভ করতে না পারায় এ সকল সংস্থা থেকে সাহায্য না পাওয়া।

(তিন) বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ না থাকায় বিদেশ থেকে নগদ মূল্যে খাদ্যশস্য আমদানি করার অসুবিধা।

(চার) স্বাধীনতার পর ভারতীয় বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশ থেকে জিনিষপত্র কিনে নেওয়ায় বাজার শূন্য হয়ে যায়। অথচ বাজারে দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করার কোনো ব্যবস্থা হয় নাই।

(পাঁচ) আরব—ইসরাইল যুদ্ধ এবং আরব বিশ্বের তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ্ব মুদ্রা তহবিলে মুদ্রাস্ফিতি দেখা দেয় যা বাংলাদেশের জন্য মরণ ছোবল হানে।

(ছয়) পাকিস্তান থেকে ১৯৭৩/৭৪ সালে ৫ লক্ষ আটকে পড়া বাঙ্গালি দেশে ফিরেন। সরকার তাদের পুনর্বাসনের অংশ হিসাবে কয়েক মাসের অগ্রিম বেতন দেয়। এ সমস্ত লোক ঐ সব টাকা দিয়ে নগদ মূল্যে বাজারে লভ্য জিনিষপত্র কিনে বাজার শূন্য করে ফেলে। বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর অভাব আর মুদ্রাস্ফিতির কারণে জিনিষপত্রের দাম বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

(সাত) এসময় তিন লক্ষ বিহারী পাকিস্তানে চলে যায়। যাবার সময় তারা যা যা পায় তাই কিনে নিয়ে যায়। কারণ তাদের নিকট তখন লুট পাটের টাকা ছিল।

(আট) মুক্তিযুদ্ধের সময় রাস্তার দুপাশের এবং নদীর ধারের গ্রামগুলো পাক বাহিনী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এসব গ্রামের হাজার হাজার অসহায় লোকেরা তখন প্রাণ ভয়ে ভারতে আশ্রয় নেয় অথবা দেশের ভিতর বিভিন্ন স্থানে ঠাঁয় নেয়। স্বাধীনতার পর গ্রামে ফিরে পুর্নবাসনের চেষ্টা করে। এমতাবস্থায় পর পর দু'তিনবার বন্যার ফলে তারা থাকার জায়গাটুকুও হারায়। এসব ছিন্নমূল মানুষ তখন বিভিন্ন শহরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু দেশে তখন ভীষণ খাদ্যাভাব এবং দুর্ভিক্ষের কারণে তাদের দু'মুঠো খাবার জোটে নাই, ফলে অনাহারে এসব লোক শহরের রাস্তায় মরে থেকেছে। নিষ্ঠুর নির্মম শহরবাসী তাদের চেয়ে দেখেছে, আপদ বলে মনে করেছে, তাদের প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখায় নাই। এক ফোঁটা পানির জন্য মৃত্যু পথযাত্রীকে কাতরাতে দেখেছি, অনেককে পানির জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে দেখেছি, ভদ্রবেশী শহরের এসব দানব প্রভুরা পানি দেয় নি, বরং তাদের দূর দূর করে তাড়িয়েছে। আবার তারাই এসব ব্যক্তির লাশকে সরকার বিরোধী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। নদী ভাঙ্গা এসব লোকের সঠিক সংখ্যাও এসব ভদ্র শয়তানেরা নির্ণয় করে নাই। অনেকেই মন গড়া সংখ্যা দেখিয়েছে। সরকারবিরোধী ভূমিকা রেখে সাদ্দাদের বেহেস্তের টিকিট কিনেছে।

ক্ষমতা দখলের পায়তারা এবং দেশী বিদেশী আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র :

১. প্রশাসনিক দুর্বলতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও সরকার তখন সংকট মোকাবেলা করছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা সঠিক অবস্থা প্রচার না করে কাল্পনিক, অসত্য তথ্য প্রচার করতে থাকে। দেশীয় ক্ষমতালোভীরা বিদেশী শক্তির সাথে একটা গোপন আঁতাত করে। এরই ফলে আমেরিকা খাদ্যশষ্যের জাহাজের গতি চট্টগ্রাম থেকে করাচী বন্দরে ফিরিয়ে দেয়।

অথচ পি এল ৮ চুক্তি মোতাবেক তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে খাদ্য-শস্য সরবরাহ করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু দেশী ষড়যন্ত্রকারীদের ইঙ্গিতে খাদ্যশস্য ভরা দুটি জাহাজ চট্টগ্রাম থেকে ফিরে গেছে। বঙ্গবন্ধু দেশের খাদ্য ঘাটতির জন্য মানবিক কারণে জরুরী ভিত্তিতে খাদ্য সরবরাহের অনুরোধ জানিয়ে দুটি জাহাজ পাঠান। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চুক্তি থাকা সত্ত্বেও খাদ্য সরবরাহ করে না। জাহাজ দুটি ফিরিয়ে দেয়। মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে বাংলাদেশের আমলা খাদ্য সচিব আব্দুল মোমেন জড়িত ছিলেন।

পঁচাত্তরের পর এই কুখ্যাত কাজের পুরস্কার স্বরূপ জিয়াউর রহমান তাকে মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেছিলেন। মার্কিনীরা ছাড়াও এ সময়ে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলি শুধুমাত্র সরকারবিরোধী প্রচারণা চালায়। যেমন : তখন চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা বন্দর কার্যত বন্ধ ছিল। বিদেশী মালবাহী জাহাজগুলি এ দুটি বন্দরে ভিড়তে পারত না। তাই তাদের কোলকাতা বন্দরে মালামাল খালাস করে বাংলা-দেশে আনতে হত। কিন্তু দেশী বিদেশী এসব ষড়যন্ত্রকারীরা বাস্তব কথা না বলে অপপ্রচার করত—সব মাল কলকাতায় নামিয়ে পাচার করা হচ্ছে। আবার এসব মালামাল আনবার জন্য যে সব গাড়ি যেত, দেশী ষড়যন্ত্র-কারীরা ওই সব গাড়ির ছবি ছাপিয়ে প্রচার করত, শত শত ট্রাক মাল বোঝাই করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ সময় ভারতীয় একদল দালাল বাংলা-দেশের এই ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মিলে প্রচার চালাত যে বাংলাদেশের অবস্থা খুব খারাপ, হিন্দুস্থান অনেক ভাল। তারা হিন্দুদের ভারতে যাবার জন্য উৎসাহিত করত। এদেরই একদল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বাংলাদেশের খাদ্যশষ্য ভারতে পাচার করত।

২. এদের সাহায্য করত নিরাপত্তা বাহিনীর একটি বিশেষ অংশ যারা ক্ষমতা দখলের নেশায়, বাম দল, সর্বহারা পার্টি ও জামাতদের সঙ্গে আঁতাত করেছিল। এরা সরকারকে হেয় করার জন্য নিজেদের দলের গাড়ি পার করে দিয়ে সরকার সমর্থক অসাধু চোরাচালানীর গাড়ি ধরে ব্যাপকভাবে প্রচার চালাত।

৩. খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের ঘাটতি পূরণের সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় সেনাবাহিনীর ক্ষমতালোভীদের ষড়যন্ত্রের জন্যে। তারা দেশের এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে তাদের ক্ষমতা দখলের উপযুক্ত সময় মনে করে সরকারী কার্যব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দেয়। কারণ তখন পর্যন্ত বেসামরিক প্রশাসন কাঠামো মজবুত হয় নাই। একমাত্র সেনাবাহিনীর সংগঠন তুলনামূলক ভাবে সংগঠিত ছিল, বিধায় ষড়যন্ত্রকারীরা এর অপ-প্রয়োগ করে। দেশের মধ্যে খাদ্যশস্য দ্রুত সরবরাহ ও বিতরণের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার সেনা-

বাহিনী নিয়োগের অনুরোধ জানালে ক্ষমতালোভী এই দল এসময়ে সেনা-বাহিনী নিয়োগে নানা অছিলায় বাধা সৃষ্টি করে। এই টানা পোড়নের সময় ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈন্যরা বন্যা কবলিত ব্যক্তিদের উদ্ধার ও খাদ্যশস্য বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও সাঁজোয়া ও গোলন্দাজবাহিনী নিয়োগ করা সম্ভব হয় নি তাদের পঁচাত্তরের সেনা অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্য। "১৯৭৫ সালের জুলাই আগষ্ট মাসে বাংলাদেশের জনজীবনে এক নজীরবিহীন খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যজনিত বিপর্যয়ের পাশাপাশি নেমে আসে আর এক সর্বনাশা বন্যা। এই বন্যার পর পরই সারা দেশ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়। ষড়যন্ত্রকারী-দের মোকাবেলায় সরকারী আমলা, প্রশাসন এবং খোদ আওয়ামী লীগ দলীয় কর্মী বাহিনী দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ কর্মীরা প্রশাসনের ষড়যন্ত্রকারী আমলা কর্মচারীদের খপ্পরে পরে দেশের দুর্যোগ মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে ২৭ হাজার লোক মারা যায়।[১৫] দেশের ৪ কোটি লোক মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ৫,৭০০ লঙ্গরখানা খুলে ৪৪ লক্ষাধিক লোককে খাবার সরবরাহ করে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেটা ছিল খুবই নগণ্য।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সরকারী দলের লোকদের বন্যা কবলিত অসহায় লোকদের প্রতি নির্লিপ্ততা এবং সর্বনাশা বন্যার কবল থেকে দেশকে উদ্ধারের জন্য সরকার যখন ব্যতিব্যস্ত ছিল, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তখন অবাধ গণতন্ত্রের সুযোগে দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের দোহাই দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছিল।[৩]

নয়. বাংলাদেশ ভারত ২৫ বছরের মৈত্রী ও শান্তি চুক্তি :

১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ ভারত বাংলাদেশ ২৫ বছরের মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি নামে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। "জামাত থেকে শুরু করে মওলানা ভাসানীর ন্যাপ, মাওবাদী উগ্র বামপন্থী বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক দল, এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রাজনৈতিক সংগঠনগুলো, স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানপন্থী দল-গুলোর সদস্যবৃন্দ, রাজাকার-আলবদর, আল্ শামস প্রভৃতি পাকিস্তানী দালাল সংগঠনগুলোর সদস্য এবং সমাজ বিরোধীরা এবং পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি, জাসদের গণবাহিনীসহ গুপ্ত সংগঠনগুলো এক সঙ্গে প্রচার চালাতে থাকে যে, উক্ত চুক্তির ফলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতের নিকট বিকিয়ে দিয়েছেন। ইহাদের পাশাপাশি বামপন্থী ডানপন্থী বুদ্ধিজীবী, সাংবা-

দিকেরাও শুধুমাত্র সরকারবিরোধীতার খাতিরে একই প্রচারণা চালাতে থাকে এবং বিগত বাইশ বছর ধরে চালাচ্ছে।

এখানে লক্ষনীয় যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন শুরু হয় ১৯৭২ সালের ১৫ই মার্চ থেকে এবং শেষ হয় জুন ৭২। এই প্রত্যাবর্তন তখন বিভিন্ন শক্তি যেভাবে দেখতো :

১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : তাদের ধারণা ছিল, অর্থনৈতিক সংকট, দুর্বল প্রশাসনিক অবকাঠামো ঐবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তারা বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর সাহায্যে একটি পুতুল সরকার গঠন করতে পারবে।

২. পাকিস্তান চীন : এরূপ একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশ—পাকিস্তান একটি কনফেডারেশন গঠন সম্ভব হবে।

৩. ভাসানী পন্থী ন্যাপ ও মাওবাদী উগ্রপন্থীরা এবং সর্বহারা পার্টির ধারণা ছিল, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অবর্তমানে অস্ত্রের সাহায্যে তারা ক্ষমতা দখল করতে পারবে।

৪. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জিয়া দল : এক অংশ যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল তাদের আকাঙ্খা ছিল ভারতীয় বাহিনী চলে যাবার পর তারা ক্ষমতা দখল করতে পারবে। এই দল ১৯৭২ সালের আগষ্ট মাসে একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কর্ণেল জিয়া (৪৬ বিগ্রেড কমাণ্ডার) পলায়ণ করে। কর্নেল তাহেরকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়, এবং তিনি গণবাহিনী সৃষ্টি করেন। মেজর মতিউর রহমান পলায়ণ করে সরকারবিরোধীদের সহায়তায় আত্মগোপন করে থাকে। পরে পাকুন্দিয়ায় আখড়া স্থাপন করে এবং জেনারেল জিয়াউর রহমানের সহযোগিতায় সেখানে পীর মতিউর নামে খ্যাতি লাভ করে। মেজর জিয়া পালিয়ে সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করে এবং খুলনা অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। কর্ণেল (পরে জেনারেল) এম এ মঞ্জুরকে দিল্লীতে মিলিটারী এটাসি করে পাঠান হয়।

৫. সরকারী দলের কুমিল্লা দল : তারাও ধারণা পোষণ করতেন যে যেহেতু সেনাবাহিনীতে এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কুমিল্লার লোক সংখ্যাধিক্য, তাদের সাহায্যে মুজিব সরকারকে উৎখাত করতে পারবে।

উক্ত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পর উল্লিখিত সবগুলি শক্তি ও দলের আশা ভঙ্গ হয়—ঠিক যে ভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত রাশিয়া মৈত্রী চুক্তির ফলে চীন আমেরিকা পাকিস্তানের মোহ ভঙ্গ হয়েছিল। শুধু ওই একটি মাত্র কারণে তারা মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা প্রচারণা চালাতে থাকে। অথচ ঐ চুক্তির ফলে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ভারতের নিকট বিকিয়ে দেয়া হয়নি, এর পক্ষে সরকারী প্রচারণা ছিল না বললেই চলে। সরকারী নীরবতা

বিরোধীদলের প্রচারণাকে আরো শক্তিশালী করে এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত করে। এমন কি উক্ত চুক্তির ধারাগুলি সাধারণ মানুষের নিকট লভ্য ছিল না। যারা উক্ত চুক্তির ধারাসমূহ কিংবা সরকারী ব্যাখ্যা তথা চুক্তির উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা দেখে নাই, তারাও উক্ত চুক্তির বিরোধীতা করতেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম. তাদের অভিমতও তাই ছিল। কলেজের প্রিন্সিপাল, কয়েকজন উপ-সচিব, সেনাঅফিসার, জেসিও, পুলিশ অফিসার সর্বক্ষেত্রে একই অবস্থা। যখন তাদের বললাম, বিশ্বযুদ্ধের পরে, আমেরিকা জার্মান চুক্তি, আমেরিকা কানাডা চুক্তি, সিটো-সেন্টো চুক্তিসহ অনেক চুক্তির দ্বারা উন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, না লাভবান হয়েছে, সবাই চুপ করে যেতেন এবং ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির দলিল দেখতে চাইতেন। অনেকে আবার বলতেন, ওসব দেশের কথা আলাদা। পরিশেষে দেখতাম, তাদের মত বদলে গেছে এবং চুক্তির কাগজ না দেখে মন্তব্য করায় লজ্জিত হয়েছে। কিন্তু দেশের লোককে বুঝাবার যাদের শক্তি ছিল, তারা বিরোধীপক্ষের প্রচারণাকে তেমন গুরুত্ব দেন নাই। ফলে এখনো উক্ত চুক্তিকে দেশবাসী ভয় করে। অথচ মুজিব সরকারের পতনের পর ক্ষমতায় এসে কোন সরকারই কিন্তু উক্ত চুক্তি বাতিল করেন নাই এমন কি বাতিলের নূন্যতম চেষ্টাও করেন নাই। তবে তারা এখনো চুক্তির ভয় দেখান, চুক্তির জন্য মুজিব সরকারকে অপবাদ দেয় কিংবা উক্ত চুক্তি থাকার জন্য তাদের কি কি অসুবিধা হয়েছে তা কিন্তু কখনো বলেন না। বাস্তবেও চুক্তিটির কোনো কার্যকারিতা নেই তা বিগত বার্মা বাহিনীর বাংলাদেশ আক্রমণের ফলেই প্রতিয়মান হয়েছে। অধিকন্তু উক্ত চুক্তিটির ধারাসমূহ বর্তমানে বিভিন্ন পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সেটা পড়লেই চুক্তিটির সারবার্তা বুঝতে পারা যায়।

দশ. চোরাকারবারী, মজুতদারী এবং সম্পদ পাচারকারী :

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে কারা ছিলেন চোরাকারবারী, মজুতদারী, সম্পদ পাচারকারী? আর এখন কারা এগুলি করে? মেজর (অবঃ) মোঃ খুরশিদ আলী মিয়ার বর্ণনায় : পাক আমলের ব্যবসায়ী, নব্য ব্যবসায়ী। মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধো, রাজাকার, বি ডি আর, পুলিশ, সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, সেপাহী কর্ণেল, রাজনৈতিক নেতা কর্মী, শেখ নাসের, কর্ণেল তাহেরের গণবাহিনী, বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা, আওয়ামী লীগের সাংসদ, সিরাজ শিকদারের সর্বহারার কর্ণেল জিয়া, মেজর জিয়া, কাজী জাফর, শ্রমিক নেতা সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসার ছাত্র সবাই, একে অপরকে টেক্কা মেরে এ সব করছে। তারা সরকারী সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ না ভেবে ভূতের সম্পদ

মনে করতেন। অফিস আদালতের চেয়ার, টেবিল, ফাইলপত্র লুট করে নিয়ে গিয়ে ঘর সাজিয়েছে। অফিসের মূল্যবান দলিল দস্তাবেজ বাজারে পানির দামে বিক্রয় করেছে। এরা ভারতসহ অন্যান্য স্থান থেকে সস্তা দরে জিনিস কিনে, বেশি দরে বিক্রয় করেছে।[১৪] তারা '৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য শস্যসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কম দামে বিদেশে পাচার করেছে। জিয়া এরশাদ বাহিনী সুকৌশলে এসব করতে সহযোগিতা করেছে। নেতারা জনসভা করে চোরাকারবারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে, আবার তারই মালামাল সীমান্তে ধরা পড়লে লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে সেগুলি পার করেছে। ঠিক ১৯৯৩ সালে যেমন কোটি কোটি টাকার মালামাল বিমানবন্দর, সদ্রমুবন্দর দিয়ে দেশের ভিতর আসছে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে ছিটেফোটা ধরা পড়ে কিন্তু চোরা মাল আটক হলেও চোরাকারবারীরা আটক হয় না। বিচার হয় না এবং চোরাচালানের গাট্রি অনেক উপর তলায় প্রীতিবন্ধনে আটকা বলে প্রভাবশালীদের ইঙ্গিতে, আইনের ফাঁকির ফোকরে সেগুলি ছাড়া পায়। প্রশ্ন রাখা যায় ১৯৭৫ সালে যেভাবে চোরাকারবারী হতো, জিয়া এরশাদ খালেদা আমলে তার চেয়ে কম হয় না বেশি হয়? সংবাদ পত্রের পাতা খুললেই তার প্রমাণ মিলে।

এগার. জরুরী অবস্থা আইন ১৯৭৩ (২২শে সেপ্টম্বর) :

বহিরাক্রমণ, যুদ্ধ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য বাংলাদেশের যে কোনো এলাকা বা জনগণের নিরাপত্তা বিপন্ন হলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। জরুরী অবস্থা ঘোষণা হলে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণ স্থগিত এবং আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাবে না।

এই আইনজারীর পর সারা দেশে বিরোধী দল ও স্বাধীনতা বিরোধী পক্ষ এটাকে বাতিল করার দাবী জানায়। আশ্চর্যের বিষয় হল এসব দল ও সমর্থক সরকার বিগত ১৮ বছর দেশ শাসন করলেও এই আইন বাতিল বা স্থগিত করে নাই। আইনটি যে অপ্রয়োজনীয় নয়, এটাই প্রমাণ করে।

বার. ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ :

১৯৭২ সালের সংবিধান প্রবর্তনের পর বঙ্গবন্ধুর সরকার নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। যুবকদের ব্যাপকভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য ভোটাধিকারের বয়স সীমা ২১ বছর থেকে ১৮ বছরে কমানো হয়েছিল।[১৫] বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তার মুখে বিরোধীদলগুলো তেমন সুবিধা করতে পারবে না তা সবাই বুঝতে পারছিলো। তবে জাসদ যেহেতু মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর

তরুণ যুবকদের একটি বিরাট অংশকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল এবং এদের নেতৃত্বে ছিল সিরাজুল আলম খান, আ স ম আব্দুর রব সহ কতিপয় শীর্ষস্থানীয় যুবদল নেতা এবং দুজন বিখ্যাত সেক্টর কমাণ্ডার ১. মেজর আব্দুল জলিল, ২. লেঃ কর্ণেল আবু তাহের সহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা সাব সেক্টর কমাণ্ডার। তাই এ দলের বেশকিছু সংখ্যক আসনে জয় করার সম্ভবনা ছিল। কিন্তু তাদের সাংগঠনিক কাঠামোর দুর্বলতার জন্য নির্বাচনে ভাল করতে পারেন নাই। অধিকন্তু জাসদের গণবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল। তাই জাসদ—এর উদ্দেশ্য নিয়েও জনগণের দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল। এত কিছু সত্বেও তাদের কয়েকটি আসনে জয় লাভের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আওয়ামী লীগ কর্মিরা জাসদের প্রার্থীদের নির্বাচনের জন্য আবেদন পত্র দাখিলে বাঁধা সৃষ্টি করায় তারা কয়েকটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারেন নাই। এটা নির্বাচনের ভাবমূর্তি কিছুটা নষ্ট করলেও নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং যুক্তিহীন। মজার ব্যাপার হলো এই জাসদই জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদের নীল নকশার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ঐসব নির্বাচনকে বৈধ বলে স্বীকার করেছিলেন। কী স্ববিরোধী নীতি। অন্যান্য দলগুলিও পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনগণের আস্থা লাভে ব্যর্থ হন। অথচ এরাই শেখ মুজিবের বিরোধীতা করেছিলেন জনসমর্থণের দোহাই দিয়ে।

তের. ১৯৭৩ সালের ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্সের সমালোচনা :

স্বাধীনতা উত্তর নূতন রাষ্ট্রের চাহিদার আলোকে মুজিব সরকার ১৯৭৩ সালের ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্স জারী করেন। ইহা ১৯৭০ সালের ওয়ারেন্ট অব (প্রেসিডেন্ট) এর অনুরূপ ছিল। শুধুমাত্র নূতন ওয়ারেন্টে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্থান একটু উপরে দেয়া হয়। এতে সামরিক-বেসামরিক আমলারা খুব ক্ষুব্ধ হন। কারণ আমলারা সব সময়েই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা কর্মকর্তাদের পছন্দ করেন না। তাই রাজনৈতিক নেতাদের তারা ভাল চোখে দেখেন না। সব সময়ই তাদের দোষত্রুটির পিছনে লেগে থাকেন। ১৯৭৩ সালে ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্স[৬] এর অছিলায় তারা সরকার বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

চৌদ্দ. সিরাজ শিকদারের মৃত্যুর পুনঃবিচার দাবী :

কমরেড সিরাজ শিকদার সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করে শ্রেণীমুক্ত স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের সংকল্প নিয়ে ১৯৭৩ সালে গঠন করেন গুপ্ত সংগঠন পূর্ব বাংলা সর্বহারা

পার্টি।[৩] এই দলের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন লেঃ কর্ণেল জিয়াউদ্দিন, মেজর জিয়া। ১লা জানুয়ারি ১৯৭৫ চট্টগ্রামে সিরাজ শিকদার ধরা পড়েন। গুপ্ত হত্যা, রাহাজানি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর সশস্ত্র হামলা, খাদ্য ও পাটের গুদামে অগ্নি সংযোগ, খাদ্য দ্রব্য বহনকারী পরিবহন ধ্বংস ইত্যাদি অভিযোগ ছিল পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টির সদস্যদের বিরুদ্ধে। গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদের সময় সিরাজ শিকদার কোনো কিছু বলতে অস্বীকার করেন। ২রা জানুয়ারি তার দলের একটি গুপ্ত ঘাঁটি চিনিয়ে দেয়ার জন্য পুলিশ গাড়িতে করে সাভারের দিকে তাকে নিয়ে যাবার সময় হঠাৎ গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েন। পালাবার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন। অতঃপর ঘটনাটির ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন।[৪]

সিরাজের পার্টি শ্রেণীশত্রুর নামে গেরিলা কায়দায় গ্রামে গ্রামে আওয়ামী লীগারদের হত্যা করেছে।[৯] জোতদারদের হত্যা করেছে। বাংলাদেশে অসংখ্য হত্যার মালিক এই সর্বহারা পার্টির সদস্যরা। এই দলের নেতা কর্ণেল জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে জেনারেল জিয়ার যোগাযোগ ছিল। শুধু তাই নয় পলাতক অবস্থায় তিনি নাকি মাঝে মাঝে জেনারেল জিয়ার বাসভবনে আসতেন।[১১] কোনো এক অজ্ঞাত কারণে জেনারেল জিয়ার হস্তক্ষেপের জন্যই তার বিরুদ্ধে কোনো শৃংখলা জনক বাধ্যবাধকতা নেয়া সম্ভব হয় নাই। কর্ণেল জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগ রক্ষা করতেন বিপ্লবী গণবাহিনীর নেতা কর্ণেল (অবঃ) আবু তাহের। জিয়া ক্ষমতায় এসে সিরাজ শিকদারকে হিরো বানিয়ে দেন বঙ্গবন্ধুকে হেয় করার জন্য। কিন্তু কৌশলে সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্তের ফলাফল ব্যাপকভাবে প্রচার করেন না কিংবা সর্বহারা পার্টির তরফ থেকেও সিরাজ শিকদারের মৃত্যু বিচারকে চ্যালেঞ্জ করে, পুনঃ বিচারের দাবী করা হয় না। অথচ বার বার তার মৃত্যুর জন্য বঙ্গবন্ধুকে দায়ী করা হয়।

পনের. ব্যাংক, বীমা, কল কারখানায় দল লোক নিয়োগ দাবী :

আওয়ামী লীগ দলীয় লোকেরা এ সব প্রতিষ্ঠান দখল করে লুটে পুটে খাচ্ছে। এই ছিল বিরোধী দলীয় বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং নেতৃবৃন্দের একচেটিয়া প্রোপাগাণ্ডা। পঁচাত্তর উত্তর এ সবের অবস্থা কি? কেমন উন্নতি হয়েছে? না লোকশান ঠেকাতে গিয়ে ব্যক্তি মালিকানায় বিক্রি করা হচ্ছে? তারা আবার একাত্তরের বাংলার শত্রু—আমেরিকা, জাপান, ব্রিটেন প্রভৃতি বহুজাতি করপোরেশনের নিকট বিক্রয় করা হচ্ছে। এসব কার্যব্যবস্থা দ্বারা কি প্রমাণ হয় বঙ্গবন্ধুর সময় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে তার দলের লোকেরা লুটে পুটে খেয়েছিল? দক্ষ লোক নিয়োগের ফলাফল কি? আঠার বছর পরও

বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শে হাজার হাজার কর্মচারী ছাটাই করা হচ্ছে? এটা কেন করা হচ্ছে?

ষোল. ১৯৭২ সালের দালাল (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) আদেশ :

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যারা পাকিস্তানী বাহিনীকে গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারীর মর্যাদাহানীর কাজে সহযোগিতা ও সহায়তা করেন তাদের বিচার করার জন্য উক্ত আইন জারী করা হয় ২৫শে জানুয়ারি। ৯ইশে আগষ্ট ১৯৭২ দালাল আইন সংশোধন করে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ৩ বছর সাজার ব্যবস্থা করা হয়। ২১শে এপ্রিল ১৯৭৩ তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থবিরোধী কাজের অপরাধের জন্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার ৩৯ জন জন্মগত বাঙ্গালী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করেন।

দালাল আইনে সাড়া দেশে বিভিন্ন কারাগারে হাজার হাজার স্বাধীনতা বিরোধিকে আটক করা হয় এবং তাদের বিচার শুরু হয় কিন্তু দেশের অনেক বুদ্ধিজীবি রাজনৈতিক দালাল ও ঘাতকদের বিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে এমন কি মানবাধিকার সংস্থা এসব অপরাধীদের ছেড়ে দেবার দাবী জানায়। দেশী বিদেশী চাপের মুখে এবং যে সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ কোর্টে দায়ের করা হয় নাই, ৩০শে নভেম্বর ১৯৭৩ বঙ্গবন্ধু সরকার দাদাল আইনে অভিযোগ ও আটক ঐ সব ব্যক্তিদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন। এই ক্ষমা আদেশের ফলে ৩৪,৬০০ জন আটককৃত মুসলিম লীগ, পিডিপি, জামাতে ইসলামী, নেজামী ইসলামী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলগুলো এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদের নেতৃত্বে গঠিত রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি সংগঠনগুলোর নেতা ও কর্মীরা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা মুক্তি পায়। দালাল ও ঘাতকদের বিচার করার জন্য যারা সোচ্চার ছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন, মৌলানা ভাসানী, ডঃ আলীম আল রাজী, অধ্যাপক আবুল ফজল, সাপ্তাহিক হলিডের সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান। মৌওলানা ভাসানী এক পর্যায়ে ১৯৭৩ সালের ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে দালাল আইন বাতিল করার আলটিমেটাম দেন। এতো লোকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য যথাযথ সাক্ষী সাবুদ যোগাড়ের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা ও সমস্যা এবং প্রশাসনিক নিরতিশয় দুর্বলতার কারণেই বঙ্গবন্ধু এদের ক্ষমা করতে বাধ্য হন। তবে খুন, অগ্নি সংযোগ, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অপহরণ প্রভৃতি কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগে অভিযুক্ত হলে এবং বিচারাধীন থাকলে, তাদের ক্ষেত্রে এই ক্ষমা প্রযোজ্য ছিল না। এ জাতীয় মোট এগার হাজার কেস তখন বিভিন্ন কোর্টে বিচা-

স্বাধীন ছিল। জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে উক্ত আইন বাতিল করেন এবং বিচারাধীন সকলকে ছেড়ে দেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো প্রচার না করে উল্টো বঙ্গবন্ধুর ক্ষমার জন্য এদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে, ব্যাপক ভাবে প্রচার করেন। তার দল এবং উত্তরসূরীরা এখনো সেই একই গান গেয়ে চলেছেন।

সতের. কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য :

পাক-আমলে বেসামরিক কর্মচারীদের তুলনায় সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বেতন বেশি ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর সম-র‍্যাংকের সকল কর্মচারীদের বেতন সমান করা হয়। এ জন্য মুজিব সরকারকে দায়ী করা হয়। ১৯৭৩ সালের বেতন কমিশনে জিয়াউর রহমান প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য ছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীর জন্য যে গ্রেডের ও পে স্কেলের সুপারিশ করেন তা সেনাবাহিনীর বিক্ষোভকে আরো উত্তপ্ত করে। বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সেনা-বাহিনীর মনোভাব আরো বিরূপ হয়ে ওঠে।[১২] এই অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য চেষ্টা করা হয় একটি সাব কমিটির মাধ্যমে কিন্তু তখন জেনারেল জিয়া প্রায়ই মন্তব্য করতেন জেন্টলম্যান এটা স্বাধীন দেশ পাকিস্তান নয়। পাকিস্তানী নিয়মনীতি এখানে চলবে না। এখানে আমরা সবাই সমান অর্থাৎ একজন সেকেণ্ড লেঃ একজন সেকশন অফিসারের সমান বেতন পাবেন। কোনো প্রস্তাবই তিনি মানতে চাইতেন না। এমন কি ১৯৭৭ সালের বেতন স্কেলও না। তবে ক্ষমতায় এসে তিনি বাজেট ২৫-৩০% বৃদ্ধি করেন। সেটা অবশ্য বেতন স্কেলের জন্য নয়, সেনা ইউনিট দাঁড় করাবার জন্য। সেনানিবাস সমূহে বাসস্থান তৈরী, সৈন্যদের পোষাক পরিচ্ছদ অস্ত্র ক্রয় ইত্যাদির কারণে।

আঠার. ভারত বিরোধী প্রচারণা :

বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ ছিল যে তিনি ভারতপন্থী, তাই তার যে কোনো কার্যব্যবস্থার পিছনে ভারতকে জড়িত করে অভিযোগ করা হতো। যেমন :

১. স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তদানিন্তন সরকার (মুজিবনগর) কর্তৃক চুক্তিসমূহ বাতিল করা :

স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন নয় মাস মুজিব নগর সরকারের কার্য্যব্যবস্থা সাধারণত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে অথবা আকাশবানী বা বিবিসি, ভোয়ার মাধ্যমে বাঙ্গালিরা জানতে পারত কিন্তু কোনো ঘটনায় বিস্তারিত জানবার

অবকাশ ছিল না। স্বাভাবিক কারণেই স্বাধীনতা উত্তর এসব ঘটনা জানবার একটি নৈতিক অধিকার প্রত্যেক দেববাসীর রয়েছে। সে সময় সরকার ছিল তাজউদ্দিন সরকার। বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর মুজিবনগর সরকার পক্ষ, খন্দকার মোশতাক এবং শেখ মনিও শেখ আব্দুল আজিজের প্রভাবে কোণঠাসা হয়ে যায়। মুজিবনগর সরকারের ঘটনাসমূহ জানবার বা জানাবার আর সুযোগ হয় না। তাজউদ্দিনের মতো কোণঠাসা হন বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানী। এ দুই মহৎপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি দেশবাসীর সহানুভূতি জাগে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনেকের বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে। রেডিও টিভিতে যেভাবে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ইত্যাদি সর্বক্ষণ প্রচার হতে থাকে, আমার অনেক বন্ধু পর্যন্ত খবর শোনা বাদ দেয়। এমতাবস্থায় বিভিন্ন মহল থেকে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তিসমূহ জানতে চায়। কিন্তু সরকারীভাবে এ সবের গুরুত্ব দেয়া হয় নি। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে নানাভাবে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এরই সুযোগ গ্রহণ করে সরকার বিরোধী দলগুলি এবং ক্ষমতালোভী সামরিক ও বেসামরিক আমলা গোষ্ঠি। তারা প্রচার মাধ্যমে এবং গোপনে দেশবাসীর নিকট সে সব চুক্তি বাতিলের দাবী করে। তাদের প্রচার মাধ্যম অনুসারে সে চুক্তি-গুলি ছিল একটি স্বাধীন দেশের জন্য ক্ষতিকর। চুক্তি গুলো হচ্ছে :

ক. ভারতীয় সমরবিদদের তত্ত্বধানে আধা—সামরিক বাহিনী গঠন করা। গুরুত্বের দিক হতে এবং অস্ত্রশস্ত্রে এ বাহিনী ও সংখ্যায় এ বাহিনী বাংলাদেশের মূল সামরিক বাহিনী হতে বড় ও তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

খ. ভারত হতে সমরোপকরণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতে হবে এবং ভারতীয় সমরবিদদের পরামর্শ অনুযায়ী তা করতে হবে।

গ. ভারতীয় পরামর্শে বাংলাদেশের বহিঃ—বাণিজ্য কর্মসূচী নির্দ্ধারণ করা হবে।

ঘ. বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভারতীয় পরিকল্পনার সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

ঙ. বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির অনুরূপ হবে।

চ. ভারত বাংলাদেশ চুক্তিগুলি ভারতীয় সম্মতি ছাড়া বাতিল করা যাবে না।

ছ. ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে কোনো সময় যে কোন সংখ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং বাধাদান ব্যক্তিকে চুরমার করে অগ্রসর হতে পারবে।

উল্লিখিত চুক্তিগুলি জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষর করেন এবং শেখ মুজিব বঙ্গভবনে ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ২৫ বছর ভারত বাংলাদেশ (পারস্পরিক) মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তিতে সন্নিবেশিত করে বলে প্রকাশ। কিন্তু এর পক্ষে কোন দলিল নেই।

অধিকন্তু বিরোধী পক্ষগুলি খোলামেলা ভাবে প্রচার করত এবং জনগণ সত্যি সত্যি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আরো যে সব তারা প্রচার করে; সে সব অপপ্রচার গুলি হচ্ছে :

(ক) বাংলাদেশে কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না।

(খ) প্যারামিলিশিয়া বাহিনী থাকবে, যেমন রক্ষীবাহিনী। মুজিব-বাহিনী হতে লোক ভর্তি করা হবে।

(গ) তিন মাইল সীমানার মধ্যে সীমান্ত খোলা থাকবে, মুক্ত ব্যবসার জন্য।

(ঘ) পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ভারত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।

(ঙ) মুক্তিযুদ্ধে যে সব বেসামরিক কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করে নাই তাদের পদচ্যুত করা হবে এবং ইহার ফলে সৃষ্ট শূন্যতা ভারতীয় আই সি এস অফিসার দ্বারা পূরণ করা হবে।

(চ) ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে থাকবে তবে প্রতি বছর উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হবে এবং উক্ত চুক্তি পুনর্জীবিত হবে।

(ছ) বার্ষিক অথবা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্মতিপ্রাপ্ত হতে হবে।

মুজিব সরকার উল্লিখিত চুক্তিগুলি সম্পর্কে জনগণের আশঙ্কা দূর করার নিমিত্তে কোনো কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। ফলে জনগণ সরকার বিরোধীদের বিশ্বাস করে।

২. সংবিধানে সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা সংযোজনের বিরোধিতা :

১৯৭২ সালে গৃহীত সংবিধানে চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা। এগুলিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও বলা হয়ে থাকে। এ দুটি ধারাকে সংবিধানের মূলনীতি বলে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা বিরোধীদলগুলি, ভাসানী ন্যাপ, মাওবাদী উগ্র বাম রাজনীতিবিদ, সর্বহারা পার্টি এবং মৌলবাদীরা সংবিধানের এ'দুটি ধারার বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে থাকে। মৌলবাদীরা বলতে থাকে যে ইসলামে সমাজতন্ত্র নাই। সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তারা পশ্চিমা ধাঁচে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রচার চালাতে থাকে। সেই পঞ্চাশের দশক থেকে এ দেশের সকল আন্দোলনের শ্লোগান ছিল,

সমাজতন্ত্রের অর্থাৎ বড় বড় কল কারখানা ব্যাংক, বীমা, জাতীয়করণের। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন তার বাস্তবায়ন করলেন, তখন আবার প্রতিবাদ হল—সমাজতন্ত্র নয়—পুঁজিবাদ বা ব্যক্তি মালিকানা।" অথচ আমরা জানি জণগন, ব্যক্তিমালিকানার উপর ভরসা করলে শিল্পোন্নয়নের সকল উৎপাদনের ফল কেবল গুটিকয়েক লোক উপভোগ করবে—সাধারণের উপকারে আসবে না। ব্যক্তিগত মালিকগণ ব্যক্তির জন্য—সমাজের জন্য নয়?

একইভাবে তারা ধর্ম-নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে প্রচার করতে থাকে। তারা বলতে থাকে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলাম ধর্ম না মানা। মসজিদে নামাজ না পড়া। তারা আরো বললেন যে সংবিধানে এসব ভারতের পরামর্শে সংযোজন করা হয়েছে।

আসলে ব্যাপারটি উল্টো। বলা চলে ভারতের পরামর্শেই এসব মৌলবাদী দল সাম্প্রদায়িকতার উসকানী দিয়েছে। কারণ এর ফলে হিন্দু—মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকবে। দুই বাংলার বাঙ্গালিরা নিকটবর্তী হতে পারবে না। ভবিষ্যতে দুই বাংলা একত্রিত হতে পারবে না।

৩. ভারত বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস করার মতলবে গোপন বিপুল অংকের জাল নোট বাজারে ছেড়েছে :

এটা একটা মিথ্যা বানোয়াট গুজব ছিল। কারণ জাল নোট তুলে নেয়ার পর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মোট নোট ৩০ কোটি টাকার চেয়ে ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৪৮০ টাকা কম জমা হয়। জনগণকে বিভ্রান্ত করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

৪. বাংলাদেশের শিল্প কারখানার কলকব্জা ভারতে পাচার করা হয়েছে :

গুজব ছড়ান হয় যে মিত্র বাহিনী বাংলাদেশ থেকে ফিরে যাবার সময় শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে কলকব্জা খুলে নিয়ে গেছে। কথাটা আংশিক সত্য এই কারণে যে মিত্রবাহিনীর লোকেরা রাজাকার—আলবদর কর্তৃক লুটকৃত মালামালের অনেকাংশ তারা নিয়ে যায়। কিন্তু কল কারখানা নয়। আসল কথা হল—পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিগণ এই রাজাকার—আলবদরদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের কল—কব্জা, যন্ত্রপাতি, ব্যাংক আমানত ও নগদ অর্থ ৭৮ কোটি টাকা সরিয়ে নিয়ে যায়। কারখানা বা কল—কব্জা অংশে অংশে খুলে পাকিস্তানে পাচার করেছে।

৫. বাংলাদেশের সব গাড়ি পাচার করা হয়েছে :

মৌলানা ভাসানী অভিযোগ করেন যে কলকাতার রাস্তায় বাংলাদেশের মোটর জানে ভর্তি হয়ে গেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেকেই গাড়ি নিয়ে ভারতে চলে

যায়। কলকাতা পুলিশ এই সকল গাড়ি সনাক্ত করে পৃথক নম্বর দেয়। দেশ স্বাধীন হলে প্রত্যাগমনের সময় ঐ সকল গাড়ী তাদের মালিক নিয়ে আসে।

৬. বাংলাদেশ হতে ৬০০ কোটি টাকার সম্পদাবলী ভারতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে :

বিশ্ব ব্যাংক ১৯৭৬ সালে যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে দেখা যায় যে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি হতে ১৯৭৫ সালের জুন পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশকে ৯৪৫ কোটি টাকারও বেশি সাহায্য দিয়েছে।

৭. ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি ২৭শে. মার্চ ১৯৭২ :

পাকিস্তানপন্থী এবং সরকার বিরোধীরা প্রচার করতে থাকে যে, উক্ত চুক্তির ফলে অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কারণ—

(ক) বিদেশ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত পণ্যদ্রব্য ভারতে পাচার হয়।

(খ) ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান হতে উন্নতমানের আমদানীকৃত পণ্য দ্রব্য সহজে ভারতে পাচার হয়।

(গ) বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য দ্রব্য ও আমদানীকৃত চাউল ও অন্যান্য সামগ্রী সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে যায়।

(ঘ) বাংলাদেশের প্রোটিন সমৃদ্ধ ডিম-নদী-নালার মাছ, জমির শাক-সব্জি, তরিতরকারী, গৃহপালিত হাঁস-মোরগ ওপারে নিয়ে যায়।

(ঙ) সোনা, রূপা, তামা, ছোট ছোট কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সীমান্তের ওপারে ভারতে অবাধে পাচার হতে থাকে। ভারত থেকে আসে তামাক, মশল্লা, অনাবশ্যক পণ্য।

এ জিনিষগুলির কিছু কিছু ওপারে চোরাকারবারী—কালোবাজারী পাচার করলেও তবে সবগুলি অভিযোগ যুক্তিহীন এবং মিথ্যা প্রচারণা ছিল। তবে তখন সরকার পক্ষ থেকে এসব প্রচারণার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গতভাবে মোকাবেলা করা হয় নাই। লালবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়েছে। সে সময়ে চাহিদার তুলনায় বিদেশী সাহায্য ছিল খুবই নগণ্য। এমতাবস্থায় এসব ব্যাপকভাবে পাচার হওয়া—পাগী ছাড়া কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সরকার পক্ষ তখন ছিলেন নির্লিপ্ত। আমি ব্যক্তিগতভাবে সে সময়ে তিন জন গভর্ণর নিযুক্ত নেতার সঙ্গে আলাপ করে তাদের বুঝাতে ব্যর্থ হই যে, এমন অবস্থা চললে লোকজন সরকারবিরোধী হয়ে যাবে।

ইউরোপ—আমেরিকা ও জাপান তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নি। কেউ কেউ স্বীকৃতি দিলেও তাদের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি হয় নাই। কারণ পাক

আমলের ঋণ ফেরৎ দেবার বিষয়ে তখন দেন দরবার চলছে। এমতাবস্থায় ওই সব দেশ থেকে উন্নত মানের খাদ্যসামগ্রী আমদানীর প্রশ্নই উঠে না।

রাস্তাঘাটের অভাবে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় উৎপাদিত পণ্যাদি দেশের অভ্যন্তরে এমনকি রাজধানীতে নেয়া সম্ভব হতো না। কৃষকেরা উৎপাদিত এসব পণ্যের মূল্য পেত না। এসময় এক প্রকার সুযোগসন্ধানী চোরাকারবারী, সীমান্ত এলাকার পণ্যদ্রব্য ভারতে পাচার করত। সে সময় ভারতে এসব পণ্যের দাম বেশি ছিল। এখন ১৯৯৩ যেমন বাংলাদেশে চাহিদা থাকায়, শত শত ট্রাকভর্তি দ্রব্যাদি ভারত হতে বাংলাদেশে আসছে এবং বর্তমান বাংলাদেশের বাজারে ভারতীয় জিনিষপত্রে ভর্তি হয়ে আছে। তখন সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না. এখন তো উন্নত, তবুও এখনকার অবস্থা কি তখনকার চেয়ে ভাল ?

মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরে পাকিস্তানীরা বাংলাদেশের কলকারখানার যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ খুলে নেয় এবং বিজয়ের পরে বাঙ্গালিরা (মুক্তিযোদ্ধা অমুক্তিযোদ্ধা) পুটপাট করে নেয়। এই যন্ত্রাংশ কল—কারখানায় ফিরিয়ে না দিয়ে তারা চোরাপথে পাচার করত। এদের ৯০% ছিল পাকিস্তানপন্থী অথবা রাজাকার আলবদরবাহিনীর লোক। পচাত্তর উত্তর সরকারগুলি ক্ষমতায় এসে ভারত--বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তির কি পরিমাণ উন্নতি করেছে এবং বর্তমান দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ কত ? এসব বিচার বিবেচনা করলে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে বিচারণা ছিল উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং ক্ষমতালোভীদের হীন স্বার্থের চক্রান্ত।

৯. মুজিব ভারতের পুতুল সরকার এবং বাংলাদেশ ভারতের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে :

এক দিকে তখন নড়বড়ে প্রশাসন আর একদিকে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অপ-প্রচার। সত্যি কথা বলতে কি বঙ্গবন্ধু বরং দিল্লী সরকারের জন্য সমস্যা হয়েছিলেন। কেননা তাকে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা তাদেরই নেতা হিসাবে প্রকাশ্যে মত ব্যক্ত করতে লাগলেন। এমন কি কলকাতা করপোরেশনের মেয়র বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ব বাঙ্গালির নেতা বলে অভিবাদন করায় তাকে স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করতে হয়। এরই প্রেক্ষিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার 'র' তাদের কলা কৌশল প্রয়োগে জাসদ সৃষ্টি করে। জাসদ—এর সব রকম সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল।

পরে এই জাসদই বাম শক্তিগুলির সহযোগিতায় বাংলাদেশে লুট, রাহাজানী, হাইজ্যাক, ইত্যাদি চালিয়েছে কয়েকটি বছর। এসব ঘটনা এখন প্রমাণিত করেছে যে মেজর জলিল, আ স ম আব্দুর রব, সিরাজুল আলম খানসহ জাসদের প্রথম সারির সকল নেতাই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে সরাসরি ভাবে যোগাযোগ রাখতেন। আর এসব নেতাই তখন বাংলাদেশ সরকারের বিরোধীতা করতেন। ভারতবিরোধী প্রচার চালাতেন। এসব নেতাই পরবর্তীকালে জিয়া এরশাদ সরকারকে সহযোগিতা করেছেন। এরাই আওয়ামী লীগ সরকারকে ভারতীয় দালাল বলেন, অথচ নিজেরাই পরিচালিত হয়েছেন ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ দ্বারা। কি নিমর্ম পরিহাস।[১১] জাসদ এর মিশন ব্যর্থ হওয়ায় এর তাত্ত্বিক নেতা এখন আবার সমস্ত বাঙ্গালি অধ্যুষিত অঞ্চলকে নিয়ে একটি একক বাঙ্গালি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন প্রবাসী বাঙ্গালির নিকট সুদূর আমেরিকায়।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে দুই মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতীয় কতৃপক্ষের তীব্র অসন্তোষের মুখে তিনি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। জনাব ভুট্টোকে আমন্ত্রন জানিয়ে তিনি বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলেছিলেন। অন্যদিকে বাদশাহ খালেদকে জানিয়ে এবং কতিপয় ভারত বিদ্বেষী দেশে ভ্রমণ করে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন। মধ্য প্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পূণর্বহালের মাধ্যমে তিনি আরব বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই সাথে তিনি জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি বাংলাদেশে সাহায্যদাতা গোষ্টিগঠনে সক্ষম হয়েছেন এবং মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জারকে বাংলাদেশে সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অর্থনৈতিক নীতিমালায় রদবদল ঘটিয়ে তিনি বাংলাদেশের বিদেশী ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করেছেন এবং বিশ্ব ব্যাংকের সভাপতি ম্যাকনামারাকে বাংলাদেশে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন। বাংলাদেশে ম্যাকনামারার সাদরের পাশাপাশি তিনি চীনে দূত প্রেরণ করে বাংলাদেশ চীন সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। সরকারের অভ্যন্তরে ভারত সোভিয়েত প্রভাব হ্রাসের জন্য তাজউদ্দীনকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণ করেছেন। জাতি সংঘের সদস্য পদ অর্জন করে তিনি সাক্ষাৎ করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে। এভাবেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[১৯]

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সেনা অভ্যুত্থানের জন্য দায়ী কে

সম্প্রতি পত্র পত্রিকায় প্রশ্ন করা হচ্ছে, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং তার পরিবারবর্গকে নৃশংসভাবে যে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয় তা কি সেনা অভ্যুত্থান ছিল, নাকি কতিপয় সামরিক ব্যক্তির আক্রোশ ছিল? উক্ত অভ্যুত্থান কি দেশী বিদেশী চক্রান্তের ফসল ছিল? উক্ত চক্রান্তের নায়ক কে ছিলেন? উক্ত হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্যই বা কি ছিল? উক্ত অভ্যুত্থানের বিরোধিতা কেন হলো না-ইত্যাদি।

উল্লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর একজন ক্রন্দনরত সুবেদারের মুখে শুনেছিলাম ১৯৭৫ সালের পনের আগষ্ট ভোরবেলা। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মতোই তার হৃদয় বিদারক আহাজারীতে সেনাসদরের জুনিয়র কমিশন অফিসার মেসে উপস্থিত সকলে অশ্রু সংবরণ করেছিলেন। "ইয়া' আল্লাহ্ এই জালেমেরা কি সর্বনাশ করল? এরা এজিদ, এরা সীমার। এরা কিসের লোভে এমন নিষ্ঠুর কাজ করল। এরা দেশ ও জাতির কি সর্বনাশটা করল? এরা, এরা মানুষ না-পাষণ্ড। এরা জানে না, এই লোকটি সারা জীবন কি অমানুষিক কষ্ট করে দেশ স্বাধীন করেছে। এরা জানে না এরা কি পাপ করেছে? বাঙ্গালির হাতে বঙ্গবন্ধু খুন হলো ইস, এরা বাঙ্গালির কলঙ্ক। এরা ভারতের দালাল, এরা সি আই এ এর এজেন্ট। এদের হাত পা খসে পড়বে? এদের চোখ কানা হবে। এরা বেঁচে থাকতেই দোজখের শাস্তি পাবে। এরা ক্ষমতার লোভে বাঙ্গালির সর্বনাশ করেছে। এরা পাষণ্ড। স্যার, স্যার আপনারা কিছু করুন। ওদের ধরে আনুন চাবুক মারুন। ফায়ারস্কোয়াডে দিবেন না চাবুক আর পাথর মেরে মেরে ওদের দীর্ঘদিন শাস্তি দিন। জিয়া—জিয়া-তুমি ও বাঁচবে না। তোমার লাশ কেউ পাবে না। তুমি ক্ষমতার লোভ সামলাতে পারলে না মির জাফর, মোনাফেক গাদ্দার। তোমার উপর আল্লাহর গজব পড়বে।[২২]

আমি জানতাম এমনই করবে। পাকিস্তানের ইন্টের চাকুরি করে বাঙ্গালির সর্বনাশ করবে না তো কি করবে। আর—আর ঐ ছাগলটা। ঐ ছাগলটাকে খুন করা উচিৎ। সব জেনে শুনে তাকে সরাতে পারল না। এমন সর্বনাশটা করতে পারল। ঐ ছাগলটার জন্যইত এমন সর্বনাশ হলো, ছাগলটা বসে বসে ডিম পারল। বঙ্গবন্ধু ছাগলটাকে সেনাপ্রধান বানিয়েছিল। আল্লাহ-আল্লাহ, দেশটাকে রক্ষা করো।'[২৩]

সুবেদার মেজর ফারুক বললেন, লতিফ সাহেব, এসব কথা বলে আর কি হবে। না বলাই ভাল। আপনার ছেলেমেয়ে আছে?

আমার আর কি হবে স্যার। ফেরেশতার মতো লোকটাকে শয়তানেরা হত্যা করেছে, আমাদের আর বেঁচে থেকে কি হবে।

আমি অবাক হলাম। কারণ-এই জেসিও একাত্তরে বাহাত্তরে, তেয়াত্তরে বঙ্গবন্ধুর ঘোর সমর্থক ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে এসে কুমিল্লা দলে ভিড়ে যান। উত্তরবঙ্গ শব্দটাও তার নিকট দেশের জন্য অমঙ্গলজনক। ভারত পাকিস্তান ভেঙ্গে দিয়ে ভাল করে নি। এজতীয় নানা কথা বলতেন, সেই জেসিও বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সংবাদ শুনামাত্র আহাজারী করেন এবং সারা-জীবন দুঃখ করেছেন। বাঙ্গালিরা স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না।

তদানিন্তন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি। সেনা-সদরের প্রায় সকল সৈনিকই তখন আপনাকে পনের আগষ্টের ঘটনার জন্য দায়ী করেছে? প্রকাশ্যে গালি গালাজ করেছে, আক্ষেপ করেছে। সেনাসদর থেকে আপনার গাড়িটি যখন বের হয়ে গেল, পিছনে অনেকেই বলেছিলেন, বাংলার টাইটার, এবার বাংলার ছাগল হয়ে গেল। প্রকাশ্যে তখন এ নিয়ে কেউ কিছু লিখে নাই, লিখলে এতদিন বাংলার লোকেরা বাংলার ছাগল বলেই অভিহিত করত।

জেনারেল সফিউল্লাহ সেনাপ্রধান থাকা অবস্থায় তারই সেনাবাহিনীর একাংশের দ্বারা বাঙ্গালি জাতির সবচেয়ে নির্মম হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে বিধায়, সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকই এ জন্য তাকে দায়ী করেছেন। এটা অবশ্যই তার ব্যর্থতা ছিল। তার ব্যর্থতার কারণগুলি আমরা এভাবে বলতে পারি :

এক. একাত্তরের বিজয় উত্তর পলাতক মুক্তিযোদ্ধা সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা :

ষোলই ডিসেম্বরের পরে অনেক মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক এবং মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্রসহ ইউনিট লাইন থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পালিয়ে যায়। অনেকে ছুটি নিয়ে আর ফিরে আসে নাই। এসব মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকরা অস্ত্র শস্ত্র জমা না দিয়ে সে সব দিয়ে দেশের মধ্যে চুরি ডাকাতি, লুট, হত্যা ইত্যাদি করত। পলাতক হিসাবে এদের বিরুদ্ধে তখন কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই। ফলে এসব মুক্তিযোদ্ধা ও সৈনিকরা দেশের দুর্বল প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন অপশক্তি যেমন, সর্বহারা, গণবাহিনী, বাম উগ্রবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়।

দুই. উপ-সেনাপ্রধান পদ সৃষ্টি কেন হয়েছিল :

১৯৭২ সালের ৮ই এপ্রিল এর সামরিক সেনাবাহিনী অবকাঠামোতে উপ-সেনাপ্রধানের পদ ছিল না। এই পদটি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সৃষ্টির চেষ্টা

করেন জেনারেল জিয়া। মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়া তদানিন্তন সরকারের সঙ্গে সামরিক নীতি ও অবকাঠামো নিয়ে কয়েকবার সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন। ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা বলেই অন্যান্য সেক্টর কমাণ্ডারেরা অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন এবং তাই তারা জিয়ার প্রচেষ্টাতে শুধু দ্বিমত পোষণ করেন নাই, রীতিমতো বাধা প্রদান করেছিলেন। সেনাপ্রধানের সমান্তরাল আর একটি পদ সৃষ্টি একাত্তরের মতোই বিপদ জনক ছিল। এজন্য বিষয়টা সরকার তথা বঙ্গবন্ধুকে সঠিকভাবে অবগত করা তথা অনুধাবন করানো সেনাপ্রধান হিসাবে তারই প্রয়োজন ছিল। এছাড়া ১৯৭২ হতে ৭৫ পর্যন্ত সরকার নীতি প্রণয়নে যেভাবে বাধা দিতে থাকেন, সেমত অবস্থায় তাকে উক্ত পদ হতে অপসারণ প্রয়োজন ছিল। তিনি তা নিতে ব্যর্থ হন। অধিকন্তু সেনাবাহিনী পুনঃগঠন কমিটিতে চেয়ারম্যান, প্রতিরক্ষা বাহিনীর বেতন কমিটির চেয়ার-ম্যান, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাকেই দেয়া হয় যেগুলি পরবর্তীতে প্রমাণিত তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবেই, বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটিয়েছেন, অথবা এড়িয়ে গেছেন। এই পদটি যে প্রয়োজন ছিল না তার প্রমাণ-জিয়ার আমলে তিনি এই পদটি তুলে দিয়েছিলেন।

তিন. সব পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীকে ভারতে পাঠানো ঠিক হয় নি :

প্রধান সেনাপতি বঙ্গবীর ওসমানী তথা বাংলাদেশ সরকার জেনারেল সফি-উল্লাহকে বিজয় প্রাক্কালে ঢাকা মোতায়েন করেছিলেন। কারণ উক্ত সময়ে ঢাকা সেক্টরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমাণ্ডার ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ মুক্তি-যুদ্ধে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পাকিস্তান যুদ্ধবন্দীদের কিছু সংখ্যক বাংলাদেশে রাখতে হত। সে সময়ে ঢাকার কমাণ্ডার এবং পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান হিসাবে এমন দাবী তিনি করেন না, এছাড়া পাক-বাহিনীর সব অস্ত্রশস্ত্রও ভারতীয় বাহিনী নিয়ে যায়। এ ব্যাপারেও তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। সেনাপ্রধান হিসাবে তার তো কিছু দায়িত্ব ছিল। কিন্তু তা পালনে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। অথচ এগুলি পরে সরকারবিরোধী দাবীতে পরিণত হয়েছিল।

চার. সৈনিকদের প্রশিক্ষণ এবং বস্ত্র ও বাসস্থান প্রদানে ব্যর্থ হন :

বঙ্গবন্ধু তথা সরকারের বিরুদ্ধে তখন মুখরোচক সমালোচনা ছিল যে, সরকার সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করে দিচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের সার্বিক অবস্থার আলোকে সেনাবাহিনী গঠনে কি কি অসুবিধা ছিল, এ বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়া হয় নাই, শুধু বিরুদ্ধপক্ষ একাধারে বিরুদ্ধাচারণ করেছে। ইউনিফরম, মশারী কম্বল কিছুই ছিল না। বাংলাদেশে তখন

সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরীও হতো না। স্বাধীনের পর এসব জিনিষ বিদেশ থেকে আমদানি করা দরকার ছিল, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার অভাবহেতু এবং বিদেশের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য চুক্তি না থাকার কারণে হয়েছিল না, বিধায়, জরুরী ভিত্তিতে কেনা সম্ভব হয়নি। অবশ্য '৭৫ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ শুরু হয়েছিল। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিরক্ষার সংগঠন তৈরী করা হচ্ছিল এবং ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৫ সালে ৫টি ডিভিশন দাঁড় করাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কুমিল্লায় সামরিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে বিভিন্ন আর্মস সার্ভিসেস রেকর্ড অফিস এবং সেন্টার প্রতিষ্ঠার অবকাঠামোও তৈরী হয়েছিল। বিজয় দিবস থেকে শুরু হবার কথা ছিল। কিন্তু এ সব তথ্য সৈনিকদের অবগত করা হয় নাই যার দায়ভার সেনাপ্রধান হিসাবে জেনারেল সফিউল্লাহর উপর বর্তায়।

পাঁচ. সৈন্যদের বেসামরিক এলাকায় বসবাসের অনুমতি দেয়া এবং ইহার খারাপ প্রভাব :

পাক সরকার বাংলাদেশে দীর্ঘ ২৪ বছরে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোহর, সৈয়দপুরে নামমাত্র সেনানিবাস গড়ে তোলেন। বাংলাদেশে এক ডিভিশন সৈন্যের বাসস্থানও ছিল না। ফলে ৫০/৬০ হাজার সৈন্যের বাসস্থান রাতারাতি গড়ে তোলা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তাই সৈন্যদের পরিবার নিয়ে বেসামরিক এলাকায় নিজ বন্দোবস্তে থাকার অনুমতি দেয়া হয়। ইহার ফলে জামাত, তাবলীগ, সর্বহারা, গণবাহিনী এবং বামপন্থী সরকার বিরোধী দলগুলো এসব পরিবারের সঙ্গে খুব সহজে যোগাযোগ করার সুযোগ পান। এদেরই সাহায্যে সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐ দলগুলো সরকার বিরোধী প্রচারণা চালায়। তাই ব্যাপকহারে সৈনিকদের পরিবারসহ বেসামরিক এলাকায় বসবাসের অনুমতি দেয়া ঠিক ছিল না।

ছয়. মৌলবাদীদের সেনানিবাসে অবাধে প্রবেশের অনুমতি :

স্বাধীনতার পর মৌলবাদীরা বিশেষ করে জামাত তাবলীগ ধর্মের আবরণে সেনানিবাসের মসজিদে মসজিদে, এমন কি ইউনিট লাইনে গিয়ে সৈন্যদের সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনা করতেন। এরা সুকৌশলে তাদের দলীয় মতবাদ সৈন্যদের মধ্যে প্রচার করত। সেনানিবাসে ধর্মীয় আলাপ আলোচনার এ জাতীয় অনুমতি দেয়া ঠিক হয় নাই যা কোনো দেশের সেনাবাহিনীতে দেয়া হয় না।

সাত. সৈনিকদের অবাধে তাবলীগ জামাতে যোগদানের অনুমতি :

জামাত তাবলীগ শুধু সেনানিবাসে প্রবেশ করতো না, সৈন্যরাও দলে দলে তাবলীগ জামাতে যোগদান করতে শুরু করে। কোনো কোনো ইউনিট হতে বাস ভর্তি করে কাকরাইল মসজিদে যেতেন। এ জাতীয় জনসমাবেশে সেনাবাহিনীর সদস্যদের যোগদান সামরিক শৃংখলার পরিপন্থী।

আট. বাংলাদেশে নিয়মিত বাহিনীর প্রয়োজন নাই, গণবাহিনী চাই :

স্বাধীনতা উত্তর বিরুদ্ধ দলগুলির আর একটি অপকৌশল ছিল, নিয়মিত বাহিনীর প্রয়োজন নাই, আমরা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। ভারত একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে শত্রুতা করে লাভ কি? এজন্য নিয়মিত বাহিনীর পরিবর্তে ১৫ লক্ষ গণবাহিনী গঠনের প্রচার চালায় জামাত, গণমুক্তি বাহিনী ইত্যাদি দলগুলি। একদিকে তারা সরকারকে দোষারূপ করে রক্ষীবাহিনী দ্বারা সেনাবাহিনী শেষ করছে। আবার অন্যদিকে প্রচারণা চালান যে নিয়মিত বাহিনীর প্রয়োজন নাই—গণবাহিনী চাই। এই প্রচারণার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী হতে তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সৈনিকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। চাকুরী যাবার ভয়ে অনেকে আতঙ্কিত হয়।

নয়. সেনা ইউনিট তথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবকাঠামো গঠনে বিলম্ব করা :

পাকিস্তান হতে হাজার হাজার আটকে পরা বাঙ্গালি সৈন্যরা দেশে ফিরলে তবে নুতন সেনা ইউনিট খাড়া হবে। এরূপ প্রত্যাশায় সেনা ইউনিক খাড়া করতে বিলম্ব ঘটায় মুক্তিযোদ্ধা সৈন্যরা সরকার বিরোধী প্রচারণায় আকৃষ্ট হয় এবং হতাশ হয়। এদিকে শত শত মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটে সংযুক্ত ছিল। এদের স্বাভাবিক নিয়মে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা সম্ভব ছিল না। কারণ তাদের বয়স বেশি, কারো বা বয়স কম, আবার স্বাস্থ্যগত ব্যাপারও ছিল। অথচ কোন এক অদৃশ্য নির্দেশে এদের বছরের পর বছর ইউনিটে সংযুক্ত রাখা হয়। চাকুরী না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে এরা বিরোধীদলে তথা গণবাহিনী, সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করে। অথচ এদের দ্বারাও সেনাবাহিনীর ইউনিট খাড়া করা যেত। কারণ এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আটকে ছিল। আটকে পড়া বাঙ্গালিরা ফেরার পর এদের বিশেষ পেনশন দিয়ে বাড়ি পাঠান যেত।

দশ. প্রত্যাগত সৈন্যদের বেকার বসিয়ে রাখা :

সেনাবাহিনীর অবকাঠামো অনুমোদন না থাকায় ২৮ হাজার আটকে পরা সৈনিকের বাংলাদেশে আগমন এক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করে। তাদের ঢাকায় নব গঠিত কতিপয় ইউনিটে সংযুক্ত করে রাখা হয়। এদের থাকার ব্যবস্থা ছিল না। খাবার ব্যবস্থা ছিল না। এ সব সৈন্যরা পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যাম্পে মানবেতর জীবন যাপন করে স্বাধীন দেশে অনেক আশা নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু এখানেও তাদের অধিক মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। লঙ্গর খানা, মেস থেকে কাড়াকাড়ি করে খাবার সংগ্রহ করতে হত। ঘরের মেঝেতে, বারান্দায় মাসের পর মাস, বৃষ্টি বাদলে ভিজে থাকতে হয়েছে। এমনি অবস্থায় কুমিল্লা অঞ্চলের সৈনিকদের একচেটিয়া আধিপত্য এবং সেই সংগে সরকারবিরোধী দলগুলি এ সব সৈন্যদের মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা বিভ্রান্ত করেছে। এদের তখন একটু সহানুভূতি কিংবা সঠিক অবস্থা জানাবার কেউ ছিল না। চাকুরী থাকবে কিনা এরূপ একটি দুর্ভাবনায় তাদের রাত দিন কাটাতে হত। হতাশায় অনেকে জাসদের বিপ্লবী গণবাহিনীর তালিকা ভুক্ত হয়। আবার অনেকে সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করে। উল্লেখ্য যে অনেক অফিসার ও গণবাহিনী ও সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করে। কুমিল্লার গণবাহিনীর সদস্যরা ঢাকা বিমান বন্দরে প্রত্যাগত সৈন্যদের বিমান থেকে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে সুকৌশলে বলতো :

১. দেশের অবস্থা খুব খারাপ। পাকিস্তান থেকে এসে ভুল করেছেন।

২. সর্বহারা দল সারাদেশ দখল করে ফেলেছে। বাড়িতে নিরাপদে যেতে পারবেন না টাকা পয়সা ব্যাংকে রেখে যাবেন।

৩. এই সুযোগে চাকুরী না করলে ফরম পূরণের সময় না করে দিন। (এরূপ বলার ফলে উত্তর বঙ্গের সৈনিকেরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ তারাই বেশির ভাগ চাকুরী না করার পক্ষে মত দেয়)।

৪. বিরুদ্ধ দলে যোগ দিন। কারণ এ সরকার দু-তিন মাসের বেশি আর টিকতে পারবে না। এ জন্য সিনিয়র সব অফিসার বিমান বন্দর থেকেই অবসর নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন।

৫. এখানে থাকার ব্যবস্থা নেই, খাবার বন্দোবস্ত নেই, এভাবে চাকুরী করতে পারবেন না।

৬. খুব সম্ভব দেশে আর্মি রাখবে না। রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে। চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার হয়ে গেছে।

৭. বড় বড় পদে ভারতীয় অফিসারেরা কাজ করছে।

৮. মুক্তি বাহিনীদের দু'বছরের সিনিয়রিটি দেয়া হয়েছে। এখন ৫০% তারাই আগে পদোন্নতি পাবে, তারপর ৩০% বাংলাদেশে যে সব সৈন্যরা

ছিল তারা, আর ২০%. পাকিস্তানে আটকে পরা সৈন্যরা পাবে। পদোন্নতির এই কোটা পদ্ধতির ফলে সেনাবাহিনী দুই দলে বিভক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধারা ভাবতো ওরা এসে তাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার সুফল দখল করছে। আর পাক ফেরত সৈন্যরা ভাবত, এরা দেশে থেকে সব লুটেপুটে নিয়েছে। জুনিয়র হয়েও দু-টো পদোন্নতি নিয়েছে, আবার চাকুরীতে দু-বছরের জৈষ্ঠ্যতা পেয়ে মাতব্বর হয়েছে। এই দুই দলে বিভক্ত হবার ফলে সেনাবাহিনীর একতা, শৃংখলতা নষ্ট হয়ে যায়। নুতন সেনাবাহিনীর জন্য যা আরো ক্ষতি করে।

এগার. এরশাদকে এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল নিয়োগ করা ঠিক হয়নি :

পাক-প্রত্যাগত লেঃ কর্ণেল এরশাদকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরে সরাসরি এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল নিয়োগ করা হয়। অথচ তিনি মুক্তিযুদ্ধে জেনারেল টিক্কা খানের স্নেহভাজন ছিলেন। তার আনুগত্য ও স্বাধীনতা বিরোধীতা পুরস্কার স্বরূপ নিশান-ই-পাকিস্তান খেতাবে ভূষিত হন। তাকেই সরাসরি এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হয়। অথচ পাকিস্তান থেকেও যেসব সিনিয়র অফিসার মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য সব রকমের চেষ্টা করেন, এমন কি তাদের কাজ কারবার পাকিস্তান বিরোধী ছিল, তাদের সেনাবাহিনী থেকে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়। ব্যাপক প্রচারণা সত্বেও জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয় নাই। এ সময় সিনিয়র টাইগার বলে পরিচিত ব্রিগেডিয়ার এ খলিলকে বিডিআর এ ডিজি নিয়োগ করা হয়। কোন অদৃশ্য শক্তির বলে এরশাদ এতো বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পেলেন তা সবারই জিজ্ঞাসা ছিল। অথচ এই নিয়োগের ফলেই তিনি ক্লাইভের মতো ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি জিয়ার খুব প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন এবং তার মাধ্যমেই জিয়া আটকে পরা বাঙ্গালি সৈন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ট হতে সক্ষম হন। তার পরামর্শে জিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের পদোন্নতির কোটা রহিত করেন। এই কোটা রহিতের ফলেই আটকে পরা সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের অতিক্রম করে পদোন্নতি পেতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনীর সেন্যদের সাহায্যে পনের আগষ্টের ঘটনা ঘটাতে পারেন।

সেনাপ্রধান হিসাবে জেনারেল সফিউল্লাহ এরশাদের সেনাসদরে নিয়োগের ব্যাপারে কি ভূমিকা পালন করেছিলেন তা জানা যায় নাই। তার মত পাকিস্তানপন্থী অফিসারকে কিভাবে এরূপ পূর্ণপদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, জেনারেল সফিউল্লাহ দেশবাসীকে তা জানাতে পারেন নাই।

বার. সেনাবাহিনীতে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একচেটিয়াত্ব :

বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ মূলতঃ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈন্যদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছিল। দশ জন সেক্টর কমাণ্ডারদের মধ্যে সিনিয়র তিন জনই ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানী ইস্ট বেঙ্গলের ছিলেন। বিজয় উত্তর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রভাব অধিকতর মাত্রায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে অন্যান্য সব কোর রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈন্যরা কোণঠাসা হয়ে যায়। এমনকি স্বাধীনতা বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য দ্বারাই অর্জিত হয়েছে, অন্যরা পাকিস্তানপন্থী, এমন একটা কটাক্ষ পরিলক্ষিত হতো। বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাদে অন্যান্য কোর। রেজিমেন্টের সেক্টর কমাণ্ডারগণও এই প্রভাব বলয় থেকে রেহায় পান নাই। কমাণ্ডার মেজর আব্দুল জলিল, মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর জয়নাল আবেদীন, মেজর রফিকুল ইসলাম, মেজর এ, টি, এম হায়দার, মেজর সি আর দত্ত, মেজর আবু তাহের—এদের অবদানকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হতো না। পরবর্তীতে উনারা সবাই ছিটকে পড়লেন। মুক্তিযুদ্ধের কমাণ্ডারদের ন্যায় অন্যান্য অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যেও এই অসমতা ব্যাপক অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তান প্রত্যাগত অন্যান্য পদাতিক রেজিমেন্ট যেমন—পাঞ্জব, বেলুচ ও ফ্রন্টিয়ার ফোর্সেস থেকে যে সব অফিসারকে বেঙ্গল রেজিমেন্টে আত্মীকরণ করা হয় তাদের প্রতিও সুনজর ও সুব্যবহার করা হতো না। প্রকাশ্যে বলতে দেখেছি—বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর নেই-সব ঐতিহ্য নষ্ট করে ফেলল পাঞ্জাব, বেলুচ'র ফ্রন্টিয়া'র-এর অফিসাররা। এদের কেন যে বেঙ্গলে দিল। এ সময়ে এই সমস্ত অফিসারদের নিয়ে আর একটি পদাতিক রেজিমেন্ট দাঁড় করালে সব দিক দিয়ে ভাল হত কিন্তু বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্তারা তাও হতে দেয় নি। তখন সেনাবাহিনীতে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করেছি :

এক. উত্তরবঙ্গ বা নর্থবেঙ্গল শব্দটি ব্যবহার করা যেত না—মুখ ফসকে বের হলেও দেখতাম, কুমিল্লাবাসী বন্ধুরা ভ্রূ কুঁচকে তাকাতেন। ঠিক যেন পাঞ্জাবীদের মতো।

দুই. বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর স্বাধীনতা এক—যেন মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। মুক্তিযুদ্ধের আলাপের সময়েও দেখতাম অন্যান্য কোরের লোকদের প্রতি তারা ব্যঙ্গ করতেন। এমন কি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কোনো কথা পাকিস্তান ফেরত সৈন্যদের তারা বলত না। অনেক প্রশ্ন করলে তবে বলত। সেও থেমে থেমে লাগাতার কোন ঘটনা বলতো না। শুধু তখন কেন, এই ১৯৯৩ সালেও অনেক বন্ধুকে ১৯৭১ সালের কথা জিজ্ঞাসা করলে এড়িয়ে যান, বলতে চান না।

তাদের এড়িয়ে যাওয়া ভাব আর সরকারী নীরবতা—সব মিলে পাক ফেরত সৈন্যদের মধ্যে একটা হতাশা, আশাভঙ্গ এবং নিরুৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হতো। এ জন্যই একজন সাপ্লাই কোরের সৈন্যের সঙ্গে অর্ডিন্যান্স কোরের সৈন্যের ভাব হয় খুব। সাঁজোয়া গোলন্দাজ বাহিনীর মধ্যে একাত্মতা গড়ে ওঠে। তারা বসে বসে পাকিস্তানে ফেলে আসার সুখ দুঃখের গল্প করতো—কিছুটা তৃপ্তি লাভ করতো। এ সবই ছিল পঁচাত্তরপূর্ব পাক ফেরত সৈন্যদের মর্মজ্বালা। ১৫ই আগষ্টের ঘটনার সাঁজোয়া বাহিনী, বেঙ্গল ল্যান্সার এবং গোলান্দাজ বাহিনী ২ ফিল্ড আর্টিলারীর সৈন্যদের সম্মিলিত অভিযান পরিচালনায় ভূমিকা ছিল মুখ্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একইভাবে পরে সাপ্লাই ও অর্ডিনান্সের সৈন্যদের একাত্মতা, সিগন্যাল, সিনিয়র ই এম ই আয়ের সৈন্যদের মধ্যে একাত্মতা গড়ে উঠেছিল—মূলত বেঙ্গল রেজিমেন্টের একচেটিয়া প্রভাবের বিরুদ্ধে। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এসব এড়িয়ে গেছেন। সেনাভবনের মতো বিশাল প্রসাদে বসে তদানিন্তন সেনাপ্রধান এসব ঘটনা জানতেও পারেন নাই। কিন্তু তারই পাশের কর্তার বাসায় প্রতিদিন শত শত সৈনিক যেতেন—জিয়াকে সুখ দুঃখের কথা বলতেন। আর সে সব আলাপের মধ্যে ১৫ই আগষ্টের বীজ বপন করা হতো।

তের. সৈন্যবাহিনীর চেয়ে রক্ষীবাহিনীর গুরুত্ব বেশি দেবার ফলে সৈন্যদের অসন্তোষ বেড়ে যায় :

রক্ষীবাহিনী গঠনের পর তাদের পোষাক দেয়া হয় এবং তাদের থাকার জন্য নূতন নূতন চারতালা—পাঁচতালা আবাসিক এলাকাও গড়ে তোলা হয়। তাদের বেতনও সেনাবাহিনী সিপাহীর চেয়ে বেশি ছিল। রক্ষীদের ক্ষমতার অপব্যবহার ছিল। তিন-চার রক্ষী মিলে সৈন্যদের মারধর করার ঘটনাও ঘটেছে। কিছু কিছু উগ্রপন্থী রক্ষীর এসব দুর্ব্যবহারের জন্য স্থানীয়ভাবে প্রতিবাদের কোনো ফলাফল পাওয়া যায় নাই। দুই বাহিনীর এ সব ছোট খাট ঘটনা সরকার বিরোধী দলগুলি এবং সাংবাদিকরা ফলাও করে পত্রিকায় প্রকাশ করতো। কিন্তু তেমন কোন প্রতিকার হতো না। সেনাকর্মকর্তারা সৈন্যদের এসব ঘটনা শুনতেও চাইতেন না। এক প্রকার তাচ্ছিল্যভাবে বলতেন আমরা কি করব, তোমাদের জাতির পিতার পোষ্য পুত্র ওরা। নিজেরাই বন্দোবস্ত করো। এ জাতীয় হতাশাপূর্ণ ঘটনা সৈন্যদের মনবলের উপর দারুণ আঘাত করতো। অথচ, কর্তা ব্যক্তি, ফোন করেও রক্ষীবাহিনীর অফিসারকে বিষয়টি অবগত করাতে পারতেন এবং সেনা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট তার সৈন্যের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু তারা করেন নাই। কারণ নীতি নির্ধারণ করাও তখন অনেকটা গা-ছাড়া দেও-

য়ার মতো অবস্থা। ভাবখানা এমন যা হয় হোক আমার কি। আমিতো রাজার হালে আছি। অর্থাৎ অফিসারদের তখন প্রমোশন পরীক্ষায় পাশ করা আর পদোন্নতি নেয়া। একজন মুক্তিযোদ্ধা সৈনিক জেনারেল জিয়ার বাসা থেকে বের হয়ে আর একজন সৈনিকের সঙ্গে তখন প্রাণ খুলে বলতো এর (সেনা প্রধান) সফিউল্লাহ দ্বারা কিছু হবে না। ধামা ধরা। কিছু বলতে পারে না। স্যার (জিয়া) দুঃখ করে বললেন, তিনি অনেক চেষ্টা করছেন ওদের (সেনাপ্রধান ও শেখ মুজিব) জন্য হচ্ছে না। স্যার (জিয়া) সব জানেন। তিনি…। দুই বন্ধু মুচকি হাসতেন। আর এভাবেই জিয়ার জনপ্রিয়তা সৈনাদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়।

চৌদ্দ. বামপন্থীদের লাগামহীন প্রোপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে কার্যব্যবস্থা না নেওয়া :

নীতিহীন, লক্ষ্যহীন, চরিত্রহীন বামপন্থী নেতারা সরকারবিরোধী মিথ্যা, বানোয়াট প্রচারণা চালাতেন। এক বিশেষ গোষ্ঠির সঙ্গে আঁতাত করে এসব করতেন কিন্তু সেনা কর্তৃপক্ষ এসব প্রচারণার বিরুদ্ধে কোনো কার্য-ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। এ সব বামপন্থী নেতারা যেমন : কাজী জাফর, সিরাজুল আলম খান, মশিয়র রহমান, আনোয়ার জাহিদ, আসম আবদুর রব, এদের দ্বিমুখী ভূমিকার বিরুদ্ধে সরকারী কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। অথচ পঁচাত্তর উত্তর এ সব নেতা সরকারী দল সমর্থন দিয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। শ্রমিকনেতা থেকে শিল্পপতি হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছে।

পনের. গণবাহিনী ও সর্বহারা পার্টির সদস্যদের সেনাবাহিনীর মধ্যে অপ-প্রচারের বিরুদ্ধে কার্যব্যবস্থা গ্রহণ না করা :

সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ক্ষমতা দখলের জন্য জাসদ এর গণবাহিনী এবং স্বাধীন পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি আঁতাত করে সেনাবাহিনীর সদস্যদের তাদের দলের সদস্যভুক্ত করে। এভাবে তারা সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গড়ে তোলে। জাসদ সৃষ্টির পর হতে তারা সেনাবাহিনীর মধ্যে লিফলেট বিতরণ করে সৈন্যদের বিদ্রোহ করার আহবান জানায়। জাসদ এর জঘন্য কার্যের বিরুদ্ধে পালটা তেমন কোনো ব্যবস্থা সেনা কর্তৃ-পক্ষ গ্রহণ করে নাই বরং সেনা কর্তৃপক্ষ তাদের এ সব কার্যকলাপের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। জাসদ সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী সংস্থার সেনা কমাণ্ডারদের নিয়োগ পর্যন্ত করেন। সুবেদার জালাল, সুবেদার মাহবুব, সুবেদার শামসুল হক, নায়েক সিদ্দিক ছিলেন বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার কমা-ণ্ডার। সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় এ জাতীয় কর্মতৎপরতা ছিল,

সেনাআইন পরিপন্থী। এ সব নেতাদের সঙ্গেও জেনারেল জিয়া শলাপরামর্শ করতেন। আর সে খবর সেনা প্রধান জেনারেল সফিউল্লাহও জানতেন।

এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জাতির ক্রান্তিলগ্নেও একদল সেনা অফিসার সেনাবাহিনী গঠনের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান—আর তাদেরই অমানুষিক পরিশ্রমেরই ফল—আজকের এই সেনাবাহিনী। এই অফিসারগণ হলেন — মেজর জেনারেল কাজী গোলাম দস্তগীর, মেজর জেনারেল মোঃ আবদুল মতিন, টিকিউএ, মেজর জেনারেল আবদুল মান্নান সিদ্দিকী, মেজর জেনারেল মোঃ ওয়াজিউল্লাহ, পিএসসি, ব্রিগেডিয়ার দেয়ান ইউসুফ হায়দার, কর্ণেল মোসলেহউদ্দিন, কর্ণেল জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ব্রিগেডিয়ার শামসুদ্দিন আহমেদ, মেজর জেনারেল আবদুল মনাফ, মেজর জেনারেল আমজাদ আহমেদ চৌধুরী, লেঃ জেনারেল মোঃ নূর উদ্দিন খান, ব্রিগেডিয়ার আবদুল মোমেন, লেঃ জেনারেল এ এস এম নাসিম, বিবি, ব্রিগেডিয়ার মো: ইব্রাহীম, লে: কর্ণেল সাজ্জাদ জহির প্রমুখ।

আর এদেরই পাশাপাশি যারা ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারায় মশগুল ছিলেন তারা হলেন—লে: জেনারেল জিয়াউর রহমান, মেজর জেনারেল এম এ মঞ্জুর, মেজর জেনারেল এইচ এম এরশাদ, লে: কর্ণেল আবু তাহের, লে: কর্ণেল জিয়াউদ্দিন, মেজর ফারুক রহমান, মেজর রশীদ, মেজর শাহ-রিয়ার প্রমুখ।

ষোল. ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা :

সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা স্বাধীনতা উত্তর কয়েকবার তারা করেছেন কিন্তু প্রতিবারই বাধাগ্রস্ত হয়েছেন ক্ষমতার ভাগা-ভাগী নিয়ে এবং ক্ষমতার ধরন নিয়ে। এ জাতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা ১৯৭২ সালের আগষ্ট মাসে নেয়া হয়, সেনাসদরে সকল ব্রিগেড কমাণ্ডারদের সম্মে-লনে আলোচনার এজেণ্ডার মধ্যে দেশের সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাসন ক্ষমতা দখলের আলোচনা হয়। ক্ষমতা দখলের পদ্ধতিগত কারণে কর্ণেল তাহের ও কর্ণেল জিয়াউদ্দিন ইহার বিরোধীতা করেন। কর্ণেল জিয়া জাসদ-এর নীতিগুলি বাস্তবায়ন করার পক্ষপাতী ছিলেন। কর্ণেল জিয়া-উদ্দিন দেশের সর্বস্তরের লোকের জন্য এবং জেনারেল জিয়া পশ্চিমা ধাঁচে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে তাদের ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। কমাণ্ডারগণও দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। ঘটনাও ফাঁস হয়ে যায়। তবে জিয়ার সুপারিশে কর্ণেল তাহেরকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান এবং একটা পা হারাবার জন্য মানবিক কারণে তাকে পেনশন দেওয়া হয়।

লে: কর্ণেল জিয়াউদ্দিন (৪৬তম ব্রিগেড কমাণ্ডার) এর শাস্তি হতে পারে এই আশঙ্কায় পালিয়ে যান এবং সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেন। সেনাবাহিনীতে তখন জোর গুজব ছিল যে, তিনি চট্টগ্রামে চাকমাদের শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কাজ করেন। এমন গুজবও ছিল যে তিনি মাঝে মাঝে সেনানিবাসে আগমন করতেন, শেরাটন হোটেলে থাকতেন। জেনারেল জিয়ার সঙ্গে আলাপ করতেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে পুলিশ কিংবা সেনা গোয়েন্দা সংস্থা তাকে ধরত না। তাঁকে কেন ধরা হলো না সেনাপ্রধান হিসাবে জেনারেল সফিউল্লাহ ভাল জানবেন। একজন ব্রিগেড কমাণ্ডার সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে গিয়ে বিরোধী দলে যোগ দিয়ে, আত্মঘাতী কার্যকলাপে জড়িত হলেন, অথচ তাকে ধরার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। জিয়া, সাত্তার এবং এরশাদ সরকারের সঙ্গে আঁতাত ছিল বলে জোর গুজব আছে। অসংখ্য হত্যা অপরাধের সঙ্গে জড়িত একজন জঘন্য অপরাধী কি-ভাবে বর্তমানে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন! আর খালেদা সরকার বিচার না করে তাকে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করলেন![১৭]

এ সময়ের মেজর মোহাম্মদ মতিউর রহমান সেনাসদরে কর্মরত অবস্থায় পালিয়ে যান এবং আত্মগোপন করে থাকেন। গুজব শোনা যায় যে, তিনি জেনারেল জিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশের সকল মৌলবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। পলাতক সত্ত্বেও তাই কর্ণেল জিয়াউদ্দিনের মতো তাকে জিয়া এবং সাত্তার সরকার ধরেন নাই, বিচার করেন নাই।

জেনারেল সফিউল্লাহ পনের আগষ্ট এর ঘটনাকে একটি সন্ত্রাসমূলক ঘটনা বললেও একটি কথা তিনি নিশ্চয় মনে রাখবেন আর তা হলো—"১৯৭৫ সালের প্রারম্ভে গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে উৎখাতের কম পক্ষে সম্ভাব্য ৫টি ষড়যন্ত্রের তদন্ত চলছিল। একজন অফিসার স্ত্রীর শাড়ী কেনার জন্য কলকাতা গিয়ে একজন পশ্চিমা কূটনীতিকের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বসেন।[৬] কিন্তু এসবই ছিল দেশী-বিদেশী দীর্ঘ দিনের ষড়যন্ত্রের ফসল, কোনো অকস্মাৎ ঘটনা নয়।

জিয়ার ষষ্ঠাঙ্গ :

মেজর মতিউর রহমান সেনাসদর থেকে পলায়নের পর সৈন্যদের মধ্যে একটা চুটকি চালু হয়েছিল—জিয়ার পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্চ রিপু কাকরাইলে মোনাজাত করছে। অর্থাৎ মেজর মতি পালালে কি হবে কাকরাইল মসজিদে গা ঢাকা দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মেজর মতি জেনারেল জিয়ার আশীর্বাদ নিয়ে পলাশী নামে একটি হাউজিং সমিতি করেন এবং সেনাবাহিনীর

বহু সদস্য উক্ত আবাসিক সমিতির সদস্য হন। মেজর মতি পালানোর পর সবার মাথায় বাজ পড়ে। তবে এ যে চুটকি সে অনুযায়ী যারা তাকে ধরেছে এবং দেখা করেছেন তার জমির প্লট পেয়ে গেছেন এবং বাড়িও করেছেন। যা হউক জেনারেল জিয়ার ষষ্ঠাঙ্গ নিম্নরূপ বুঝাত। তাদের কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে জানা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা সেনাপ্রধান হিসাবে নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

১. মেজর (পরে মেজর জেনারেল) নূরুল ইসলাম শিশু। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে জিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে মত বিনিময় করতেন।

২. কর্ণেল (অব) আবু তাহের জাসদ গণবাহিনীর কমাণ্ডার।

৩. কর্ণেল জিয়াউদ্দিন পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টির সাধারণ সম্পাদক (পলাতক)।

৪. কর্ণেল এইচ এম এরশাদ পাক প্রত্যাগত সৈনিকদের মুখপাত্র।

৫. মেজর মতিউর রহমান—(পলাতক পীর) মৌলবাদীদের সমন্বয়কারী মুখপাত্র যার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করতে সক্ষম হন।

৬. মেজর ফারুক রহমান—অসামরিক ও বৈদেশিক যোগাযোগকারী মুখপাত্র।

আঠার. অফিসারদের সুষ্ঠভাবে তাৎক্ষণিক নিয়োগ না করা :

স্বাধীনতা উত্তর সেনাবাহিনীতে অফিসারদের শৃংখলার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এক একজন অফিসার নিজেকে মহারাজা মনে করতেন। কেউবা অফিস করতেন বুক খোলা জামা পরে, কেউবা বুট পরে আবার কেউবা টুপি না পরে। কারো কারো মাথায় লম্বা লম্বা চুল। অনেক অফিসার ওসমানীকেও পরোয়া করতেন না। বাংলাদেশকে তখন তারা কি যে মনে করতেন একমাত্র খোদা জানেন।

তারা নিজেরা নিজেদেরকে শাসক মনে করতেন। যেন তাদের জন্য কোনো আইন কানুন নিয়ম নীতি কার্যকরী না।

অফিসারদের এসব কীর্তি কাহিনী দেখে সৈন্যরা অবাক হতেন। অনেকে ভাবতেন, দেশটা স্বাধীন হয়ে কি যে হল। বাংলাদেশ সরকারকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান মনে করতেন। সৈন্যদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, ওরা কি? দেশ আমরা স্বাধীন করেছি, যুদ্ধ আমরা করেছি। নেতা কি?

টীকা : জেনারেল জিয়ার সঙ্গে জেনারেল মঞ্জুর খুব খাতির ছিল। এ দুজনকে সৈনিকরা দুধ-ভাই বলতেন। আবার জেনারেল এরশাদের সঙ্গে জেনারেল আতিকুর রহমানের খুব খাতির ছিল এজন্য সৈন্যরা তাদের পীর ভাই বলতেন।

দেশের জনগণের প্রতি অফিসারদের আচরণ এমন ছিল—আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন না করলে পাক বাহিনী তোদের শেষ করে দিত। অতএব তোরা (জনগণ) আমাদের হুকুম মতো চলবি। আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এখন ওরা নেই, আমরা আছি। আমরাই এখন তোমাদের শাসক, প্রভু। কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের এমন ঔদ্ধত্য আচরণ, পাক থেকে আটকে পড়া অফিসারদের আগমন পর্যন্ত ছিল। যেহেতু আটকে পড়া অফিসাররা মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র ছিলেন, কাজেই তাদের বাধ্য হয়েই মান্য করতে হতো। পাকিস্তান থেকে প্রায় বার শত বাঙ্গালি অফিসার প্রত্যাবর্তন করেন। সিনিয়র এবং সংখ্যাধিক্যের জন্যে অচিরেই মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্রভাব দৃশ্যত বিলীন হয়ে যায়। এদেরই অনেকে তখন হতাশ হয়ে কর্ণেল তাহেরের গণবাহিনীতে যোগ দিলেন। কেউ বা জিয়াউদ্দিনের সর্বহারা পার্টিতে যোগ দিলেন।

পাকিস্তান থেকে অফিসারদের আগমনের পর, নিরাপত্তা ক্লিয়ার করে তাদের নিয়োগ করতে অনেক সময় লাগে। অধিকাংশ অফিসার ঢাকায় বসে বসে নিজের ভাগ্য অনিশ্চয়তার মুহূর্ত গুণতেন।

ওদিকে সেনাসদরে জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর অবকাঠামো তৈরির শুধু আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। কোনো কিছু চূড়ান্ত হয় না। ফলে ইউনিট খাড়া হতেও বিলম্ব ঘটে। অফিসার নিয়োগে বিলম্ব হয়। জিয়া গম্ভীর হয়ে কালো চশমা পড়ে বলেন : আমরা চেষ্টা করছি, সরকারের অসুবিধা আছে। তাই বিলম্ব হচ্ছে ঘাবড়াবার কি আছে। তোমরাতো পানিতে পড়ছো না।

এমন অবস্থাতেই সব অফিসারেরা সরকারবিরোধী দলের প্রচারণার শিকার হন। ধীরে ধীরে তারাও ক্ষমতা দখলের জন্য সেনাবাহিনীর মধ্যে যে উগ্র দলটি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল তারা তাদের খপ্পরে পড়েন অথচ পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসব অফিসারদের সঠিকভাবে তাৎক্ষণিক নিয়োগ প্রদান করতে পারলে তারা ঐ ক্ষমতালোভীর খপ্পড়ে পড়তো না এবং বাংলার ইতিহাসও অন্য রকম হতো।

ঊনিশ. অফিসার ও সৈন্যদের ব্যবধান সৃষ্টি :

মুক্তিযুদ্ধের সময় অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বাধীনতাউত্তর এ ব্যবধান দ্রুত কমতে থাকে। অফিসারেরা দ্রুত সম্পদশালী হতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তান আর্মিতে অফিসার আর সৈনিকদের সম্পর্ক অনেকটা রাজা প্রজার মতো। অফিসারেরা শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আর সৈনিকরা শাসিতদের মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধে এর অবসান হয়ে-

ছিল। কিন্তু স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে অফিসারেরা নিজেদের শাসক দল মনে করতে থাকে। অন্যদের সঙ্গে চা পান করা, এক সঙ্গে নাস্তা খাওয়া, গল্প গুজব করা, এসব স্বপ্নাতীত হয়ে যায়। তখন সৈনিকদের ব্যাটমান (গৃহ-ভৃত্য) হিসাবে নিয়োগ করা হতো। অফিসারদের পরিবারবর্গ নিজেদেরকে আরো একধাপ বেশি বড় মনে করতো। অনেকেই সৈনিকদের তাদের ভৃত্য মনে করতেন। ফলে সৈন্যরা মনে মনে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। জাসদের গণবাহিনীর প্রচারণায় তারা অফিসারদের বিরুদ্ধে এসব ক্ষোভ কাজে লাগায়। কিন্তু এগুলি প্রতিরোধ করার কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় নাই।

উল্লিখিত আলোচনা হতে প্রতিয়মান হয় যে, একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এবং সেনাবাহিনী প্রধান হয়ে সেনাবাহিনীর ঐক্য ও শৃংখলা বিধানে জেনারেল সফিউল্লাহর যে প্রজ্ঞা, দৃঢ়তা ও কূটকৌশল অবলম্বন করা উচিৎ ছিল তা তিনি করতে পারেন নি। অধিকাংশ সৈন্য তার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করতেন। তখনকার বিশৃংখল অবস্থায় তার কঠোর হওয়া উচিৎ ছিল। তা তিনি হতে পারেন নাই। তবে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের ঘটনা শুধুমাত্র সেনা প্রধানের ব্যর্থতার জন্য সংগঠিত হয়েছে বলা ঠিক হবে না। এ জন্য সেনাবাহিনীর অবস্থার পাশাপাশি তখনকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছাড়াও ঘটনাটি দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের ফসল ছিল। রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার অপ্রতুলতা, পুলিশ, বিডিআর, রক্ষীবাহিনীর প্রতিরোধ ব্যর্থতা, সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা সার্ভিসের ব্যর্থতা এবং সেনাবাহিনীর তরিৎ রণকৌশল ব্যবস্থার অভাব—এসবও পনের আগষ্ট ক্ষুদ্র একটি অভ্যুত্থানকে প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সাঁজোয়া ও গোলন্দাজ বাহিনী সারারাত ধরে বিমান বন্দরে নাইট ট্রেনিং এর অছিলায় থাকল, অথচ সেনাসদরের কোন অনুমোদন ছাড়াই সে প্রশিক্ষণ হলো, সেনাগোয়েন্দা পরিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা তথা সেনাপ্রধান ও সি জি এসকে জানাতে ব্যর্থ হয়েছিল। তার মানে গোয়েন্দা বাহিনীর পুরোটাই ঐ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। কারণ সে রাতে গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা কর্তব্যরত ছিল। তবে সে কর্তব্য তারা সেনাপ্রধান বা সি জি এস এর বিপক্ষ শক্তির জন্য পালন করেছিল যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তদানিন্তন জি এস ও—১, লেঃ কর্ণেল মোহসীন, (পরবর্তীতে যিনি জিয়া হত্যা কাজে জড়িত বলে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলেছিলেন)।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পটপরিবর্তনের নেতৃত্বে কে ছিলেন

এক. বেগম খালেদা জিয়ার তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা বলেছেন, স্বাধীনতার স্বপক্ষের এই ব্যাপক জনগোষ্ঠি অর্থাৎ দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী মুক্তিবাহিনী ও সাধারণ জনগণ পনের আগষ্টের পট পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার উক্তিটা গোলমেলে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কারণ বিগত ১৯৭৫ সালের পনের আগষ্ট রাত্রিতে এবং সকালবেলা বাংলাদেশের আটকোটি মানুষ এবং সেনাবাহিনীর সদস্যরা হয় ঘুমিয়ে ছিলেন নয় সকাল বেলার নিত্য দিনের কাজ কর্মে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এক শত চল্লিশ জনের ঘাতক জল্লাদবাহিনী ছাড়া এই কুকর্ম, অপকর্ম, তথা নিষ্ঠুর বর্বর নিমর্ম হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আর কেউ জড়িত ছিলেন না। হত্যাকাণ্ড কে কে করেছিলেন সেতো তাদের মুখেই আমরা শুনেছি। তবে কথাটা হচ্ছে নেতৃত্বের। ঐ জল্লাদবাহিনীর নেতা কে ছিলেন। ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা অবশ্য জানেন কে ছিলেন ঐ নেতা। ওই নেতা নিজেও তার পরিচয় দিতে চান নি কারণ —কাজটি ভাল ছিল না, মহৎ ছিল না সে জন্য এতো বছর পরেও ওই নেতার সুযোগ্য কর্মী হুদা সাহেব নেতার নামটি বলতে লজ্জা পান, সংকোচবোধ করেন। কারণ অবশ্য একটা আছে আর তা হলো. কোন ডাকাত ডাকাতি করে ধরা পরলেও বলে না সে ওই অপকর্মটি করেছে। হুদা সাহেবেরা সে দিন ৩২ নম্বর সড়কের বিশ্ববাঙ্গালির নন্দিত বাড়িটিতে ডাকাতিই করেছিলেন। কারণ ঐ বাড়িতেই বাঙ্গালির ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল। সেই চাবি কাঠি হুদা সাহেবের দস্যু নেতা, বঙ্গবন্ধু এবং তার আপন জনদের হত্যা করে ডাকাতি করে ছিনিয়ে এনেছিলেন। যেহেতু কাজটি ডাকাতি ছিল তাই হুদা সাহেব ব্যারিষ্টারী কায়দায় অপকর্মটির দায় তার নেতার ঘাড়ে না চাপিয়ে স্বাধীনতার স্বপক্ষের এই ব্যাপক জনগোষ্ঠির উপর চাপিয়েছেন। বাহ্‌বা, চমৎকার অপকৌশল, এই না হলে বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার। তবে কথাটা একদিক দিয়ে ঠিক—ব্যারিষ্টার সাহেবের এই ব্যাপক জনগোষ্ঠি অর্থাৎ ঐ ১৪০ জনের ঘাতক জল্লাদবাহিনীর বেশির ভাগ স্বাধীনতার স্বপক্ষের না হলেও নেতাটি কিন্তু স্বাধীনতার স্বপক্ষেরই ছিলেন। আর তা ছাড়াও ১৪০ জনই নেতা ছিলেন না। নেতা একজনই হন এবং তিনিই নেতৃত্ব দেন। যেমনটি দিয়েছিলেন পনের আগষ্ট ১৯৭৫ পতাকা উড়াবার পবিত্রতম কাজটির সময়। তবে ব্যারিষ্টার সাহেবকে ধন্যবাদ যে তিনি অন্তত একটি জিনিষ প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন এবং দেশবাসীকে জানিয়েছেন, পনের আগষ্টের জল্লাদবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষের লোক। আমরাও তা স্বীকার করি, কারণ তিনি ক্ষমতালোভী হলেও মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথমে সেক্টর পরে ব্রিগেডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তথ্যমন্ত্রীকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি জানাবার জন্য ধন্যবাদ।

দুই. বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানী পনের আগষ্ট ঘটনার অনেক কিছু জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু মুখ খুলে কিছু বললেন না। মাঝে মধ্যে রাগ করে, যা তার স্বভাব বললেন, "হত্যাকাণ্ডের হি ওয়াজ দা ডার্ক হর্স।" একবার বলেছিলেন ডার্ক হর্স ক্ষমতার লোভে সি আই এ এর পরামর্শে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। বঙ্গবীর পনের আগষ্ট পট পরিবর্তবের নেতার নাম বললেন না আমার খুব দুঃখ হল, কারণ তাঁর মুখে নামটি শুনতে আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। শেষে তিনি বলেছিলেন, নামটি নিতে আমার খুব কষ্ট হয়রে।" অর্থাৎ পনের আগষ্ট পট পরিবর্তনের নেতা হলেন 'ডার্ক হর্স'। কে সেই ডার্ক হর্স?

তিন. ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের সময় যারা সেনাসদরে কর্মরত ছিলেন, তাদের অনেকের কাছেই শুনেছি একই কথা। ওদের (ডালিমদের) দিয়ে তিনি (জিয়া) এই জঘন্য কাজটি করেছেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের পরিবর্তন যে সব সৈনিক চাইতেন, তারাও ক্ষোভের সঙ্গে বলতেন, কাজটি ঠিক হয় নাই। মেজর আবু বক্কর সিদ্দিক স্থির থাকতে পারত না, দিনে অন্তত বিশ তিরিশ বার বলতো—'এতো বড় অন্যায় সইবে না। আল্লাহর বিচার দেখিস-জিয়াকেও লোকে মেরে ফেলবে। বেঙ্গলের লোকেরা তাকে ছাড়বে না।'

সুবেদার জেড এ খান বলতেন, 'শেখের লাশ পড়েছিল, জিয়ার লাশ শকুনে খাবে। আয়ুবের মতো সামরিক শাসক হতে চান তিনি। ফরিদপুরের বৃদ্ধ সুবেদার মোঃ আজিজ বলতেন, 'ক্ষমতার লোভে মানুষ অমানুষ হয় স্যার—এবার নিজ চোখে দেখলাম। কালো চশমার মধ্যে দিলটাও যে এত কালো। দেশটার উপর আল্লাহর গজব পড়বে।' সুবেদার আফতাব আহমেদ (কুষ্টিয়া বাড়ি) বলতেন, 'কি স্যার বলছিলাম না, যে লোক একবার পাকিস্তানের নুন খেয়েছে, সাত জন্মেও সে পাকিস্তানের মায়া ছাড়তে পারবে না। এবার হলো-ত। জাতির পিতাকে মারলেন, এবার জাতিকে মারবেন, তৈরী হয়ে থাকেন, কিছু দিনের মধ্যেই আবার আপনার সাধের ইসলামাবাদ যেতে পারবেন। বাঙ্গালিরা স্বাধীনতার অর্থ বুঝবে কি? গোলামির জাত স্বাধীন থাকবে?'

দুই একজন ব্যতিক্রম ছিল। সুবেদার জালাল আহমেদ (জাসদের বিপ্লবী গণবাহিনীর অন্যতম কমাণ্ডার) উল্লাস করতেন। বললেন, 'স্যার ছিলেন

তো পাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের কি দেখেছেন। উনিও (বঙ্গবন্ধু) দেখেন নাই। ক্ষমতায় বসে শুধু নিজেদের লোককে বড়লোক করেছিলেন। ভালই হল। জিয়া কাজটি ভালই করেছেন।' তার মতো কুমিল্লার সুবেদার মেজর খলিলুর রহমান (টেনো) খুবই উল্লসিত ছিলেন, বললেন, যারা এখনো বেঁচে আছেন, তাদেরও মারা উচিৎ। বেটাদের আগেই মারা উচিৎ ছিল। তবে স্যার মোশতাককে ক্ষমতায় বসানো উচিৎ হয় নাই। পলেটিশিয়ানদের বিশ্বাস নেই। জিয়াকে নিজেই ক্ষমতায় বসতে হত। স্যারকে আমি বলেছিও।'

বললাম খলিল সাব, রেডিওতে ডালিম বলছেন, খোন্দকার মোশতাক এ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন?

'আরে স্যার, বুঝলেন না, এটা একটা চাল আর কি। ইনটারন্যাশনাল সমস্যা আছে না মিলিটারি ক্যু হলে আবার সাহায্য বন্ধ হতে পারে। সে জন্য মোশতাককে সামনে রাখা হয়েছে। যাক কটা-দিন পর বুঝতে পারবেন।'

তখন পর্যন্ত আমি হত্যাকারী কিংবা ষড়যন্ত্রকারীদের ঠিকমতো সনাক্ত করতে পারছি না। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নিকট যাবার চেষ্টা করেও পারছি না। জিয়ার সঙ্গে আর কারা আছে, জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আবার কাকেও জিজ্ঞাসা করতেও ভয় হচ্ছে। অবশ্য কয়েক দিনের মধ্যেই জানতে পারলাম, পনের আগস্ট রাতের ঘটনার সঙ্গে অমুক অমুক রয়েছে। পরে তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করেছি কিন্তু তারা মুখ খুলতে রাজি হয় নাই। তবে সকলেরই প্রায় এক কথা "বঙ্গবন্ধুকে মারার কথা ছিল না। তাকে ২ ফিল্ড অথবা বঙ্গভবনে রেখে সামরিক আইনের মাধ্যমে ছয় মাস (পাঁচ বছর?) দেশ শাসন করার কথা ছিল।' অনেকে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুকে ২ ফিল্ড আর্টিলারীতে রেখে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করার কথা ছিল।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার ব্যাপারে ১৮ জনের বেশি লোক জানতো না। এটা খুব গোপন রাখা হয়। মূল পরিকল্পনার সঙ্গে এই আঠারজন জড়িত ছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্র দূত বোস্টার এই ১৮ জনের একজন ছিলেন। এছাড়া মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব, হেনরী কিসিঞ্জার, পাকিস্তান সরকার এবং সৌদী সরকার পনের আগস্টের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

এই আঠার জন জল্লাদের পরিকল্পনা ছিল বঙ্গবন্ধুকে দেখা মাত্র হত্যা করা। কিসিঞ্জার বাংলাদেশ পরিভ্রমণ কালে গোপনে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন নাকি তিনি বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন "তবেই শেখের ঘাটির পতন ঘটবে। তাকে জীবিত রেখে কিছু

করতে পারবে না। তাকে মারতে পারলে দশ বছর চোখ বুজে রাজত্ব করতে পারবে।"[২১]

কিসিঞ্জারের পরামর্শ এবং কলা কৌশল মোতাবেক খুব সূক্ষ্মভাবে হত্যা-কাণ্ড পরিচালনা করা হয়। এ জন্যই দেখা যায় বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর একটা ধুম্রজাল ছড়ান হয়। মুজিব হত্যার সঙ্গে জড়িত অফিসারগণ এক এক জন এক এক রকম বক্তব্য দিয়েছেন। সত্য কথা কেউ বলেন নাই। যা বলেছেন মূল ঘটনাকে আড়াল করার জন্য। সেভাবেই পরিকল্পনা ছিল।[২]

চার. মেজর ফারুক বার বার বলেছেন, তারই পরিকল্পনা মোতাবেক পনের আগষ্টের ঘটনা ঘটেছে। ফারুক বলেছেন, মেজর নূর গুলি করেছে। মেজর নূর বলেছে অন্যের কথা। আর একজন বলেছেন, মোসলেম সারোয়ার এক সঙ্গে গুলি করেছেন।

তবে সেদিন অংশগ্রহকারী সেনাদের বলা হয়েছিল যে, গোলাগুলির মধ্যে শেখ সাহেব নিহত হয়েছে। সাঁজোয়া বাহিনীর সৈন্যরা তাই বিশ্বাস করে-ছিলো। ওদিকে গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যদের বলা হয়েছে যে, ও সি ইউ আবদুল হাফিজ (নাটোর বাড়ি) ক্রসিং করার সময় এল এম জির ট্যাগারে হাত লেগে হঠাৎ করে শেখ সাহেব গুলি খেয়ে মারা গেছেন। এ জন্য সবাই দুঃখিত। এসব ছিল চালবাজি।

পাঁচ. অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের সব সময় বলা হয়েছে—আমাদের সঙ্গে খোন্দকার মোশতাক আছেন। প্রায় সব মন্ত্রীরা আছেন। মোশতাকের নির্দেশেই এসব করা হচ্ছে। তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রী হতে রাজি হয়েছেন। দেশে সামরিক আইন জারী করা হবে। মূল ক্ষমতা থাকবে আর্মির হাতে। নির্বাচনের পর জেনারেল জিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবে।

ছয়. পনের তারিখ সকালে মেজর ডালিমের বেতারভাষণেও বলা হয় যে অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিচ্ছে খোন্দকার মোশতাক আহমেদ। বাংলার জন-দরদী নেতা। একই সঙ্গে বলা হয় যে জিয়া সেনাপ্রধান হয়েছেন এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কি?

পনের তারিখ সকাল সোয়া সাতটায় সেনাপ্রধানের অফিসের সামনে অনেক লোকের সামনেই ডালিম জিয়াকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এই বলে "আদার ওয়াইজ ইউ আর দা হিরো অফ ইনটায়ার শো" আপনিই নাটের গুরু। বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী রিসালদার মোসলেহ উদ্দিনকে পরে হত্যা করেছে। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য বিদেশে চাকুরী নিয়ে যাবার প্রারম্ভে তেজগাঁ বিমান বন্দর থেকে রিসালদার সারোয়ারকে টেনে এনে হত্যা করা হয়েছিল। মৃত্যুর একদিন আগে তিনিও আমাকে বলেছিলেন, এখানে থাকতে তার ভয় হচ্ছে। গাক লিয়াকত হত্যাকারীদের মতো তাদের মেরে ফেলা হবে এই

ছিল তার ভয়। তিনিও স্বীকার করেছিলেন, পনের তারিখ রাতে জেনারেল জিয়া তাদের সঙ্গে ছিলেন। তার নির্দেশেই তারা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিলেন। কিন্তু তখন বুঝতে পারেন নাই। এখন বেঁচে থাকা মুশকিল হয়েছে। রিসালদার সারোয়ার বলেছিলেন, জিয়ার নাম বললে সাত দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হবে। তাই কেউ বলছে না। কি ভয়ানক, কি লোমহর্ষক তথ্য! ... পরেতো তাই হলো, যে সৈন্যরা জিয়াকে মুক্ত করল, রাষ্ট্রপতি বানাল, তাদেরই তিনি পাশে বসে বিচার করে ফাঁসি দিলেন! দেন নাই?

সাত. মোশতাককে সামনে রেখে অভ্যুত্থানকারীরা তাদের মতলব হাসিল করে। বোকা মোশতাক বুঝতে পারেন নাই। মাঝখান থেকে বাংলার আর এক মীরজাফরে পরিণত হলেন। খুনী মোশতাক নামে বিশ্বখ্যাতি লাভ করলেন। অভ্যুত্থানকারীরা তাকে দিয়ে অভ্যুত্থানকারীদের প্রশংসা করলেন, আইন পাশ করালেন, দেশী-বিদেশী মেহবানদের সাক্ষাৎকার এবং আলাপ আলোচনা করলেন। কিন্তু তাকে নিজস্বভাবে চলাচল করতে দেয়া হয় নাই। তিনি মুলত বঙ্গভবনে নজরবন্দী ছিলেন।

আট. মোশতাক সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্বে থাকেন মেজর ফারুক, মেজর ডালিম, মেজর আজিজ পাশা। তারা মোশতাককে স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে বিরত রাখে এবং সাধারণ লোকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে দেয় নাই। মেজর রশীদ বঙ্গভবন এবং সেনাসদরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। জেনারেল জিয়া যে ভাবে যা যা করতে বলতেন তাই তারা মোশতাককে দিয়ে করাতেন। জিয়া মুলত মেজরদের মাধ্যমে তখন দেশ নিয়ন্ত্রণ করতেন।[২/১৬] যা বাইরে থেকে বুঝবার কোনো উপায় ছিল না। আর তার পিছনে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, রাষ্ট্রদূত মিঃ বোষ্টার। মার্কিনীদের পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন বলেই জিয়া বলতে পেরেছিলেন "মানি ইজ নো প্রবলেম" "এবং" আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট। ভেবে দেখুন একটি গরীব দেশের শাসক এমন দম্ভোক্তি করে কোন শক্তিতে। ষড়যন্ত্রটির ভিত কি রকম মজবুত। কেন ২৪ বার সেনাবিদ্রোহের পরেও জিয়া সরকার টিকে থাকে এবং নব্বই এর গণজোয়ারের পরেও ক্ষমতা সেই অদৃশ্য শক্তির হাতেই থেকে যায় এবং দেশের শাসক কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব হতে পারে না। শাসক হন একজন গৃহবধূ!

নয়. মেজর ফারুক বলেছেন—শেখকে জীবিত বন্দী রাখা সম্ভব ছিল না। তাকে যে হত্যা করা হবে এটা দলের সকলে জানতো না। ফারুক নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নায়ক হিসাবে জিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন।[১০] কিন্তু ১৫ই আগষ্টের নায়কের নাম বললেন না। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এটা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। এটা জানাজানি হলে মার্কিনীদের মঙ্গলা-

কাঙ্খীদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। লোকে জানবে তিনি একজন ঠক, প্রতারক। মিথ্যাবাদী ষড়যন্ত্রকারী, খুনী এবং ক্ষমতালোভী। এতে মৌলবাদীদের স্বার্থহানী হবে। জনগণের আস্থা হারাবে।

দশ. মোশতাক শুরু থেকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী জল্লাদ বাহিনীকে "সূর্য সন্তান" আখ্যা দেন। নিজে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী নন বলে বারবার দাবী করেন। সর্বশেষে তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার দাবী করেছেন এবং নিজে সাক্ষী দিবেন বলে ঘোষণা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধুর হত্যার আসল কারিগর জিয়া বলে অভিযোগ করেছেন ২৭/১৮ এ ছাড়া মোশতাক পনের আগষ্টের লিখিত বেতারভাষণেও বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুকে সূর্য (সন্তানেরা) মিলিটারী হত্যা করেছে। বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারেও তিনি বলেছেন যে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে তাকে জানান হয়েছিল এর আগে তিনি কিছু জানতেন না।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য জেনারেল জিয়া পনের আগষ্ট সকালে সেনা সদরে সবার সামনে খুব উল্লসিত ছিলেন এবং বলেছিলেন (ডালিমকে) মস্ত-বড় একটা কাজ করেছে।[৪]

এগার. আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী শুরু থেকেই বলে আসছেন যে, মুজিব হত্যার আসল খুনী জিয়া এবং সি আই এর এজেন্ট জিয়া।[৫] মজার ব্যাপার জিয়ার পক্ষে কোন কর্তৃপক্ষ এ সব অভিযোগ আজ পর্যন্ত অস্বীকার করেন নাই।

বার. ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টে অংশগ্রহণকারী অনেকের নিকট শুনেছি যে, জেনারেল জিয়া পনের আগষ্ট রাতে তাদের সঙ্গে ছিলেন। রাত দশটায় বেঙ্গল ল্যান্সারে কনফান্স করেছিলেন। রাতে জল্লাদ বাহিনী মুভ করার সময় জিয়া বিমান বন্দরে ছিলেন। জল্লাদবাহিনীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। অপারেশনের সময় ইউনিফরমে ২ ডিল্ল আর্টিলারীতে অপারেশন রুমে বসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভোর ৬ টার বেতার ভবনে কমাণ্ডারদের ব্রিফ শুনেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতারে বঙ্গবন্ধুর হত্যার ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছেন। যাদের মুখে শুনেছি, তাদের অন্যতম—মেজর মোস্তফা, রিসালদার সারোয়ার, সিপাহী ফারুক এসি, রিসালদার সফি, দফাদার সাইদুর রহমান (বগুড়া) প্রমুখ।

তের. একটি বিষয়ে আমি এই ১৪০০ সালে ১৮ বছর পরেও অবাক হই আমার বহু দিনের সাথী যারা ১৯৭৫ সালের আগষ্ট মাসে সেনাসদর গোয়েন্দা পরিদপ্তর কিংবা অপারেশনাল পরিদপ্তরে কিংবা পি এস পরিদপ্তরে কর্মরত ছিলেন, যাদের অনেকে অবসর গ্রহণ করেছেন—পনের আগষ্ট ঘটনা সম্পর্কে মুখ খোলেন না। কোনো কথা বলতে চান না। কেন চান না। সেটা

আমার নিকট বিস্ময় লাগে, দুই একজন সরাসরি অস্বীকার করেন কিছু বলতে। কেহ বা শুষ্ক হেসে চুপ থাকেন। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত অনেকের সাক্ষাৎকার দেখিয়ে দিলেও তারা কিছু বলেন না। তবে কি তাদের বলতে মানা আছে? অবসর গ্রহণের পরেও? ভাবতে অবাক লাগে।

চৌদ্দ. বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা যাবে না—আইনটি পতিতরাষ্ট্র পতি খোন্দকার মোশতাক আহমেদ স্বাক্ষরিত কিন্তু রাষ্ট্রপতি জিয়া সাংবিধানিক আইনে পরিণত করেন। শুধু তাই নয় মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কোনো কিছু রেডিও টেলিভিশনে প্রচার নিষিদ্ধ করেন। তবে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বলার, লিখার, প্রচারের ব্যাপারে রেডিও টেলিভিশনে নিষেধ নেই। সরকারী অনুকূলে অনেক প্রকাশনা হয়েছে। জিয়া থেকে এরশাদ আমলে, সে সবে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটিয়েছে, চরিত্র হনন করেছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে দর্নীতিবাজ রাষ্ট্রনায়ক, স্বৈরাচারী শাসক, স্বার্থপর ব্যক্তিত্ব, দুর্নীতি প্রতিপালক, ইত্যাদি অপবাদে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। জিয়াউর রহমান যতদিন জীবিত ছিলেন এবং তার পরের সরকারগুলোও তখন একই ধারায় চলছে, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পিছনে শুধু জিয়াউর রহমানই ছিলেন না। যারা আছেন ক্ষমতা বলয়ে ঘুরপাক খাচ্ছেন, তারা সবাই ছিলেন। সম্ভবত সেজন্যই শ্রদ্ধেয় গাফ্ফার চৌধুরী বলেছেন, মুজিব হত্যার আসল চক্রী জিয়া। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পিছনে একটি শক্তিশালী চক্রান্ত ছিল যার মূল নায়ক ছিলেন জিয়া নিজে। উত্তরাধিকার সূত্রে সে চক্রের উত্তরাধিকারী সাত্তার এরশাদ এবং জিয়ার স্ত্রী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

অভ্যুত্থানকারীদের ঘোষণা মোতাবেক আগষ্ট হত্যার নেতৃত্বে ছিলেন খোন্দকার মোশতাক। যদি তাই হয় তবে মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে সেই মহা পুরুষকে ক্ষমতা থেকে সড়িয়ে তাকে জেলে পাঠান হল কেন? একজন অভ্যুত্থান কারীর এটা কি পুরস্কার। তাকে খুনী মোশতাক বলা হয় অথচ খুনের জন্য তার বিচার করা হয় নাই। বিচার হয়েছে সাজান দুর্নীতির দায়ে। এর মূল রহস্যই বা কি?

পনের. আগষ্টের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল স্বাধীনতা লগ্ন থেকে ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত। জিয়াউর রহমানকে বঙ্গবীর চট্টগ্রাম বন্দরে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা পালন করেন নাই। পরিকল্পনা মোতাবেক ইবি আর সি আক্রান্ত হলে তাদের উদ্ধারের জন্য জিয়াউর রহমান যান নাই। যারা যেতে চেয়েছিলেন যেতে দেন নাই। তার সৈন্যদের নিয়ে তিনি নিরাপদ অবস্থানে চলে গেছেন।

কর্ণেল এম আর চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ নিশ্চিত হয়ে তবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় হয়েছেন। তখন তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সিনিয়র সেনাঅফিসার। জনাব হান্নান সাহেবরা পাকবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য জনবল, ট্রাক ইত্যাদি সরবরাহ করে দিবার পরও নির্দ্ধারিত সময়ে পাকবাহিনীকে আক্রমণ না করে কক্সবাজার এলাকায় চলে গেছেন। পাকবাহিনী যতক্ষণ পর্যন্ত বাঙ্গালিদের প্রতিরোধ ক্ষমতা শেষ না করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সক্রিয় হন নি এবং দৈবক্রমে যখক চট্টগ্রাম বেতার শিল্পীরা তাকে বাঙ্গালি সিনিয়র অফিসার হিসাবে স্বাধীনতার ব্যাপারে বলার জন্য আহবান জানিয়েছেন তখনই শুধু রাজি হয়েছেন। কয়েক ঘন্টা ধরে একটি খসড়া করে বেতার ভাষণ দিলেও পরদিন তিনি নিজের তরফ থেকে নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ঘোষণা করেছেন। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে একটা অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে করেছিলেন। তখনকার সংগ্রামী নেতৃত্বকে অস্বীকার করার জন্য অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য। পঁচাত্তর উত্তর মুজিব নগর সরকারকে অস্বীকার করা, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রচারণা বন্ধ করা এবং বঙ্গবন্ধুর নাম পর্যন্ত রেডিও টিভিতে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে তার মতলব কিসের ইঙ্গিত দেয় আর সে প্রশ্ন গুলি শুধু প্রশ্নই জাগায়?

১. মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবীরের নেতৃত্বে একক কমাণ্ডের স্থলে আঞ্চলিক কমাণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।

২. মুক্তিযুদ্ধের সময় গোপনে ভারতীয় কমাণ্ডারদের সঙ্গে বৈঠক করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় মোশতাক, মিজান দলের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করা।

৪. বঙ্গবীর ওসমানী কর্তৃক তিনবার তাকে কমাণ্ড থেকে অপসারিত করা।

৫. তাঁর সেক্টরে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বঙ্গবীর ওসমানীর হেলিকপ্টারের উপর আক্রমণ করা। কার আদেশে উক্ত আক্রমণ করা হয়েছিল?

৬. ১৯৭২ সালে সামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব করা যা কর্ণেল আবু তাহের কর্তৃক বাধা দান করা হয়।

৭. ক্ষমতা দখল বিষয়ে কর্ণেল আবু তাহের এবং কর্ণেল জিয়াউদ্দিন এর সঙ্গে মত বিরোধ। কর্ণেল তাহেরকে চাকুরী হতে অব্যাহতি প্রদান এবং কর্ণেল জিয়াউদ্দিন কর্তৃক বিরোধী দলে যোগদান কিন্তু উভয়ের সঙ্গে জেনারেল জিয়ার লিয়াজোঁ রক্ষা করা।

৮. জেনারেল এরশাদের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে আগত সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং অফিসারদের সঙ্গে আঁতাত করা।

৯. জেনারেল নুরুল ইসলাম শিশুর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক রক্ষা করা।

১০. বরখাস্তকৃত সেনাঅফিসারদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর হত্যা সংক্রান্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা।

১১. কর্ণেল তাহের, কর্ণেল জিয়াউদ্দিন ও কর্ণেল (পরে লেঃ জেনারেল) এরশাদকে পাশ কাটিয়ে বরখাস্তকৃত অফিসারদের মাধ্যমে সরকারী দলের মধ্যে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে আপসরফা করা এবং আমেরিকা, সৌদী আরব, লিবিয়া ও চীনের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুকে উৎখাত তথা হত্যা করে ক্ষমতা দখল করা।

১২. মেজর ফারুক—রশীদ চক্রের নিয়ন্ত্রণে রেখে খোন্দকার মোশতাক আহমদকে দিয়ে প্রথমে সামরিক শাসন জারী করা, সরকারীদলের একাংশকে দিয়ে পুতুল সরকার গঠন করা এবং জরুরী কতকগুলি নির্দেশ জারী করা।

১৩. বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। ইত্তেফাক, হলিডে এবং ভোয়া বিবিসি ইত্যাদি প্রচার মাধ্যমে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যে এই হত্যাকাণ্ড ছয়জন মেজর কর্তৃক সংঘটিত এর সঙ্গে কোনো সিনিয়র অফিসার জড়িত নেই। যেমন, হলিডে এর সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান পনের আগষ্ট ৭৫ কে সামরিক অভ্যুত্থান না বলে সামরিক বাহিনীর কতিপয় বিশৃংখল সদস্যের হঠকারী কর্তব্য বলে মনে করেছেন এবং এটাকে একটি গণ অভ্যুত্থানের প্রাক মুহূর্ত বলেছেন।

১৪. কর্ণেল আবু তাহেরের গণবাহিনীর সাহায্যে খালেদ মোশাররফ এর বিদ্রোহ দমন করা এবং তাকে হত্যা করা।

১৫. ক্ষমতা দখল করে ত্রাসের সৃষ্টি করা। স্পট কিলিং নীতি গ্রহণ করা।

১৬. কর্ণেল আবু তাহেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী পদ থেকে সরিয়ে ফেলা (অর্থাৎ ফাঁসি দেওয়া)।

১৭. মেজর মতিউর রহমান (পলাতক) এর সাহায্যে স্বাধীনতা বিরোধীদের পুণর্বাসনের মাধ্যমে ক্ষমতা পাকা করা। মুক্তিযোদ্ধাদের কোণঠাসা করা।

১৮. ১৯৭৫ সালের আগষ্টের প্রারম্ভে গোয়েন্দা বিভাগে বঙ্গবন্ধুকে উৎখাতের কম পক্ষে পাঁচটি সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের তদন্ত চলছিল।[৬] এই ষড়যন্ত্রগুলির নেতৃত্বে কারা ছিলেন? এগুলি প্রকাশ পেলেও প্রমাণ হবে পনের আগষ্টের মূল নায়ক ছিলেন সেই বিষবৃক্ষ ক্ষমতালোভী তদানিন্তন সেনা উপ-প্রধান লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমান পি এস সি।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার না করা, জেলে জাতীয় চার নেতাকে হত্যার বিচার না করা, সিরাজ শিকদারের হত্যার পুনঃ বিচার না করা, খালেদ

মোশাররফ এর হত্যার বিচার না করা। জিয়া সমর্থকরা এবং জিয়ার বি এন পি কর্মকর্তা সেই ১৯৭৫ হতে এখন পর্যন্ত খালেদ মোশাররফকে দেশদ্রোহী এবং ভারতীয় দালাল বলে আখ্যায়িত করেন, অথচ জেনারেল জিয়া সরকার খালেদ মোশাররফ, কর্ণেল এম এন হুদা এবং কর্ণেল এটি এম হায়দারের মৃত্যু সরকারী কাজে আরোপনীয় বলে ঘোষণা করেন এবং তাদের পরিবারবর্গকে মিলিটারী পেনশন প্রদান করেন। এমন কি বেগম খালেদা জিয়াও মুক্তিযুদ্ধে পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে তাদের নাম উল্লেখ করত তাদের পরিবারকে পদক প্রদান করেছেন। এসব কর্মকাণ্ডে কি প্রমাণিত হয়—মহাবীর খালেদ মোশাররফ দেশদ্রোহী ছিলেন?

জেলের ভিতরে তড়িঘড়ি করে কর্ণেল তাহেরের গোপন বিচারে তার ফাঁসি দেয়া হয় এবং বিচারের দস্তাবেজ এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা হয় নাই। তাহেরের দল ছাড়াও বহু সামরিক বেসামরিক লোকের ধারণা যে কর্ণেল তাহের জিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিধায় তাঁকে যেনতেন ভাবে ফাঁসি দিয়ে তাঁর পথের কাঁটা সরিয়েছেন। কারণ তাহেরের চেয়েও গুরুতর অপরাধ করা সত্বেও মেজর ফারুক, মেজর রশীদ, মেজর ডালিম চক্রের বিচার করেন নাই এবং তাদের বিচার না করার জন্য সংবিধানে আইন সন্নিবেশিত করেছেন, কারণ তাদের বিচার করলে জিয়া নিজেও ধরা পড়বেন।

১৯. বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতাকে হত্যার বিচার না করে তাদের হত্যাকারীদের বরং পুরস্কৃত করা হয়:

ক. ক্ষমতা দখল তথা সেনা বাহিনীর নিয়ম শৃংখলা ও আইন অবমাননা ও ভঙ্গের দায়ে সেনাবাহিনী থেকে ১৯৭৪ সালে বরখাস্তকৃত অফিসার মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর সাহরিয়ার, মেজর রাশেদ চৌধুরী এবং মেজর নূরকে সেনা বাহিনীতে ১৯৭৭ সালের মে মাসে পুণর্বহাল করা হয়।[৩]

খ. তাদের দেশের বাইরে যেতে অনুমতি দেন।

গ. মেজর ফারুক রহমান ও মেজর খোন্দকার আবদুর রশীদ বাদে অন্যান্য সবাইকে বাংলাদেশের বিদেশস্থ বিভিন্ন দূতাবাসে ও মিশনে চাকুরী প্রদান করেন।[৩]

ঘ. তাদের অনেকেই পদোন্নতি পান।

ঙ. মেজর ফারুক ও মেজর রশীদকে ব্যবসা করার জন্য নানা রকম সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন।

চ. ঘাতকদের রাজনীতি করার অনুমতি দেয়া হয়।

ছ. তাদের সরকারীভাবে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়।

জ. নানাবিধ রাষ্ট্র বিরোধী কাজে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তাদের অবাধে চলার সুযোগ সুবিধা প্রদান করেন।

ঝ. নানা অপ-প্রচারে সরকারী সহায়তা প্রদান করা।

২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ খুনের খুনী সফিউল আলম প্রধানকে মুক্তি দেয়া হয় :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে গোলমাল এবং এক পর্যায়ে প্রকাশ্য দিবালোকে সাত জন ছাত্রকে খুনের নেতা এবং হোতা সফিউল আলম প্রধানকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং সরকারীভাবে পুনর্বাসন করে রাজনীতি করার অধিকার দেয়া হয়। মেজর ফারুক রশীদের মতোই একজন জঘন্য খুনীকে সমাজে এভাবে পুনর্বাসন করার অর্থ কি এবং এখন তিনি কল্পনাহীন কাজ করছেন। দেশের মধ্যে সাধারণ লোকতো এখনো তাকে ডাকাতের সর্দার বলে থাকেন, এবং জনগণ মনে করেন যে মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সফিউল আলম প্রধান দায়ী ছিলেন। এটা এখন প্রমাণিত যে জিয়াউর রহমান প্রথমে ছাত্রদের বিভেদ সৃষ্টি করে পরে তার নিজস্ব একটি ছাত্র দল গঠন করেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে তিনি পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেন।[৬] এ সময় তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করেন এবং তদানিন্তন এন এস এফ (ন্যাশনাল ষ্টুডেন্ট ফেডারেশন) গঠিত হয়েছিল সরকারী সাহায্য পুষ্টে এই ছাত্র সংগঠনে (জেনারেল জিয়ার অবদান ছিল অগ্রগণ্য)। এরই অবদানস্বরূপ পরিলক্ষিত যে সে সময়ে গড়া এন এস এফ এর ছাত্রগণ জিয়ার মন্ত্রীপরিষদসহ সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন। ঐ সকল ছাত্রদের মধ্যে ব্যারিষ্টার আবুল হাসানাত, ব্যারিষ্টার ইউসুফ।

২১. দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীসহ সমাজ বিরোধীদের বিচার হল না কেন:

পনের আগষ্ট হত্যাকাণ্ডের অন্যতম দাবী ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এ জাতীয় কোনো বিচার করা হয় নাই বরং তাদের সবাইকে নিজ দলে টেনে নিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে মন্ত্রীত্ব দিয়ে। আগষ্ট পরবর্তী কার্যব্যবস্থা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, শুধু মাত্র ক্ষমতা দখলের জন্য কতিপয় মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য অপ-প্রচার করা হয়েছে। মুজিব সরকারের কতিপয় দুর্বলতাকে অপ-ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য। গদী দখল করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য।[৬]

বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার না হওয়ার কারণ

১৯৭৫ সালের পনের আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে সমূলে হত্যা করা হলো অথচ তার বিচার হলো না—এ এক রহস্য। এক এক করে অনেকগুলি বছর অতিক্রম হলো কিন্তু রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। সারাদেশ জুড়ে প্রতিদিন সে বিচারের দাবী উঠলেও কর্তৃপক্ষ তার বিচার না করার জন্যই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—যে শক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে, তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর হত্যার দাবীদার হননি। হত্যাকারী জল্লাদ বাহিনীর প্রধান জল্লাদ নিজেই বঙ্গবন্ধুর হত্যা প্রগয়ণকারী বলে দাবী করেন, তবুও কর্তৃপক্ষ তার বিচার না করে বেকসুর খালাস করে রেখে দিয়েছেন। সব চেয়ে রহস্যজনক ব্যাপার হলো তারা বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার দাবীকে অস্বীকার করছেন না। ভাবটা এমন যে মৃত শেখ মুজিব এসে দাবী করলে তবেই তারা তার বিচার করবেন। এই শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না করার যে সব কারণ তার কয়েকটি দেখান হলো :

এক. শেখ মুজিব হত্যার ইনডেমেনিটি অধ্যাদেশ জারী : (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের নিয়ম অনুযায়ী এফ আই আর FIR না করা।

দুই. শেখ মুজিব তার শাসনকালে দেশের সহস্র মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাই দেশের মানুষ তার বিচার চায় না।

{দেশের মানুষ কারা কারা নির্যাতিত হয়েছিলেন, কিভাবে হয়েছিলেন, এ সব তথ্য দরকার, আর দেশের মানুষ বিচার চায় না, কিসের হিসাবে তারা এটা বলেন, এর উপর সরকারী কোনো প্রতিবেদন এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। তবে কিসের উপর তারা এ দাবী করছেন। সাড়া দেশ জুড়ে এত সভা সমিতি, হরতাল হচ্ছে বিচার দাবীতে, তারা কি দেশের মানুষ নয়, সরকার কি অন্ধ?}

তিন. শেখ সাহেবের হত্যার পর আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় বসে। তারা বিচার না করে ইনডেমনিটি বিলের মাধ্যমে বিচার বন্ধ করেছেন এর জন্য পরবর্তী সরকার দায়ী হবে কেন?

{ইনডেমনিটি বিলটি সেনা কর্তৃপক্ষ তৈরী করেন। বঙ্গবীর ওসমানীর কথায় সি আই এ এর পরামর্শে তৈরি। জেনারেল জিয়া মেজর চক্রের

মাধ্যমে মোশতাককে দিয়ে স্বাক্ষর করে প্রচার করে। এখানে আওয়ামী লীগ সরকারের কোন ভূমিকা ছিল না। সেটা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিন মাসের অধিক হওয়ায় বিলটি তখন বাতিল হয়ে গিয়েছিল। বাতিল-কৃত বিলটি তিনি ইচ্ছাকৃত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সংবিধানে সন্নিবেশিত করেছিলেন }

চার. আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে শেখ সাহেবের বিচার দাবী করে নাই। এ যাবৎ যতগুলি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোতে বিচারের দাবী ছিল না।

{ এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার দাবী ১৯৭৫ সাল থেকেই করা হচ্ছে। পনের আগষ্ট সকালে রেডিওর মাধ্যমে দেশে সামরিক আইনজারী করা হয় এবং সকল সভা সমাবেশ এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এতৎ সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার দাবী সকল স্থান থেকে করা হয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমগুলি তা প্রচার করতে দেয় না। তড়িঘরি করে ইনডেমনিটি বিল জারী করা হয় সামরিক আইনের আওতায়। দীর্ঘদিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ছিল। শেখ সাহেবের উপর আলাপ আলোচনা লেখা ইত্যাদির উপর সরকারীভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় যা এখন পর্যন্ত কার্যকরী আছে। তা সত্ত্বেও প্রতিদিন অসংখ্য লেখা বের হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর উপরে এবং বিচার দাবী করা হচ্ছে।

প্রতিটি নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধুর বিচারের দাবী করা হয়েছে। তবে প্রতিটি নির্বাচন হয়েছে নীল নকশা করে। আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না এই উদ্দেশ্যে। সত্যিকার নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে ফলাফল কি হবে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ নিশ্চয়ই তা অবগত আছেন। এখনতো আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে এবং সংসদে বিল উত্থাপন করেছে, তবে কেন গড়িমসি চলছে ? }

পাঁচ. সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনের সময় আওয়ামী লীগ বিরোধীদল হিসাবে সংসদে ছিল, তারা তখন আন্দোলন করে নাই কেন ?

{ তখন বিচার দাবী করা হয়েছে। বি এন পি সরকার অন্ধ তাই দেখতে পায় নি। }

ছয়. ৮৬ সালে এরশাদের পার্লামেন্টেও আওয়ামী লীগ ছিল, তখন তারা বিচার দাবী করেন নাই ?

{ তখন দাবী তারা করেছে। তাছাড়া শেখের বিচার শুধু আওয়ামী লীগের দাবী হবে কেন ? এটা জাতীয় দাবী। এতএব পুরনো কাসুন্দী ঘেটে লাভ নেই। জনগণের দাবী মোতাবেক যত তাড়াতাড়ি বিচার ব্যবস্থা হয় ততই মঙ্গলজনক }

সাত. আওয়ামী লীগ ১৯৯০ সালে তিন জোটের অঙ্গীকারে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের দাবী অন্তর্ভুক্ত করলেন না কেন ?

{ তিন জোটের অঙ্গীকারে একটি ক্লোজ ছিল হত্যা ইত্যাদি বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা নেয়া হবে। তদনুসারেই সংসদে ইনডেমনিটি বিল বাতিলের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বি এন পি সরকার বিলটি গ্রহণও করেছে কিন্তু এখন বাস্তবায়ন করছে না বিভিন্ন টাল বাহানা করে }

আট. বিচারের দাবী করা মানে বি এন পি সরকারকে নাজেহাল করা ?

কথাটা ঠিক না। তাদের কথায় ইনডেমনিটি বিলটি আওয়ামী লীগ সরকার এনেছিল। তখন বি এন পি ছিল না। তদোপরি আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রণোদিত বিল বাতিল করলে বি এন পি সরকারের ঝামেলা বা খারাপী হবে কেন ? যে হত্যার সময় বি এন পি এর জন্ম হয় নি, সেই বিচার ব্যবস্থায় বি এন পি এর নাজেহাল হবার কি আছে ! এটাও রহস্যজনক।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর যেসব সরকার দেশ শাসন করেছেন এবং করছেন তারা উক্ত বিচার না করার জন্যই দায়ী। তবে ঘটনা প্রবাহ বিচার করলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না হওয়ার জন্য যে সব কারণ সামনে আসে তা হল :

এক. ক্ষমতা দখলের উচ্চাভিলাস :

পনের আগষ্ট হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ ছিল একজন জেনারেলের ক্ষমতা দখলের উচ্চাভিলাষী আকাঙ্খা। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে কোন জেনারেলের ক্ষমতা লোভী হলে তা সাধারণত ঠেকান সম্ভব হয় না। সদ্য স্বাধীন সমস্যা সঙ্কট বাংলাদেশেও তাই ঘটেছিল। ক্ষমতালোভী জেনারেল বিদেশী শক্তির সাহায্যে ক্ষমতা দখল প্রত্যাশী হওয়ার জন্য উক্ত মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। তার এই বিদেশী সাহায্য গ্রহণটাই একটা ষড়যন্ত্র রূপ নেয়। জড়িত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদী আরব, লিবিয়া, পাকিস্তান, চীন এমতাবস্থায় মার্কিন তথা সি আই এ তথা পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার এটা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারা দুটি কারণে শেখ মুজিবকে হত্যা করতে জিয়াকে সহযোগিতা করে।

১. একাত্তরে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ এবং

২. বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র অনুন্নত দেশে গণতন্ত্র টিকে থাকলে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল, তাকে ঠেকানো।

দুই. উক্ত হত্যাকাণ্ডের কৌশল ও নীতি :

আগষ্ট ষড়যন্ত্রে কতিপয় কৌশল ও নীতি বঙ্গবন্ধুর হত্যা বিচার এর পথরুদ্ধ করেছিল। যেমন :

১. আকস্মিকভাবে বঙ্গবন্ধু তার পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনদের একই সময় নিষ্ঠুর নির্মমভাবে হত্যা করা।

২. সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা এবং চিহ্নিত ব্যক্তিদের বন্দী করা এবং তাদের সমর্থন আদায় করা। সমর্থন না দিলে তাৎক্ষনিক-ভাবে হত্যা করা।

৩. সঙ্গে সঙ্গে দেশে সামরিক শাসন সংক্রান্ত আইনজারী করা এবং স্থানে স্থানে সান্ধ্য আইন জারী করা এবং কঠোরভাবে তা পালন করা।

৪. মোশতাককে ক্ষমতায় বসিয়ে সরকারী দলের একাংশের সমর্থন দ্বারা প্রমাণ করা যে তারাই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

৫. শেখ মুজিব হত্যার ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে বিশেষ প্রচার না করা। মূল হত্যাকারীকে যাতে চিনতে বা জানতে না পারে সেজন্য নানাভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

৬. দ্বিতীয় পর্যায়ে মোশতাকের নেতৃত্বে জুনিয়র সেনা অফিসারেরা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে বলে প্রচার করা।

৭. ট্যাংক ও কামান বঙ্গভবন সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন রাখা এবং মেজর চক্র দ্বারা মোশতাককে দিয়ে যাবতীয় দস্তাবেজ স্বাক্ষর করানো।

৮. বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধের আইন করা।

৯. সংবাদ মাধ্যমকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রচারণা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।

১০. রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা।

১১. মুজিব সরকারের ভুল-ত্রুটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

১২. সরকারী কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কতিপয় আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।

১৩. সংস্কারমূলক কাজের জন্য বিভিন্ন সংস্কার কমিটি/কমিশন গঠন করা।

তিন. আমলাদের ষড়যন্ত্র :

বঙ্গবন্ধু মূলত দেশবাসীর জন্য গণমুখী প্রশাসনসহ উন্নয়নমূলক এক ব্যাপক কর্মসূচীতে ডাক দিয়েছিলেন। এতে আমলাদের স্বার্থহানি হয়েছিল। তাই তারা সেনা আমলাদের সঙ্গে মিলে বঙ্গবন্ধুকে উৎখাদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

চার. বুদ্ধিজীবীদের উদাসীন্যতা :

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা বলতে সরকারী কর্মচারী, ডাক্তার, উকিল, অধ্যা-পক শ্রেণীর অর্থাৎ পুরা বা আধা আমলা। তাদের ভূমিকাও ছিল অগতান্ত্রিক। তারা আমলা এবং সেনা-আমলাদের খপ্পরে পড়ে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাদের ষড়যন্ত্রে সামিল হয়।

পাঁচ. সাংবাদিক সাহিত্যিকদের হীনমন্যতা :

সাংবাদিক বিশেষ করে বাম ঘেঁষা সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণ তাদের সংকীর্ণতা, অদূরদর্শিতা এবং হীনস্বার্থে নির্বাচিত সরকারের বিপক্ষে মিথ্যা-চার শুরু করে।

সে সময়ের কতিপয় সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের ভূমিকার কথা ভাবলে এখন লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়। হলিডে, ইত্তেফাক, আহমদ পাবলিশিং সার্ভিস ইত্যাদি সংবাদপত্র। এনায়েতুল্লাহ খান, আহমেদ মুসা, মওদুদ আহমেদ, আহমদ শরীফ, আবদুল হামিদ, বদরউদ্দিন ওমর, ফরহাদ, মাজহার, ব্যারিষ্টার মইনুল প্রমুখের ভূমিকা ছিল খুবই মারাত্মক। এরা যেমন নিজেদেরকে অতিমানব ভাবতেন, তেমনি বঙ্গবন্ধুকে তারা মানুষ বলেই মনে করতেন না। সরকারী প্রতিটি পদক্ষেপে তারা ভূত দেখতে পেতেন। কল্পিত তথ্য দ্বারা সরকারকে নাজেহাল করতেন। ইত্তেফাকে রংপুরের বাসন্তি নামক এক বোবা গরীব মহিলাকে উলঙ্গ করে মাছ ধরার জাল পরিয়ে ছবি তুলে সারা দেশে এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়েছিল—যা ছিল মিথ্যা এবং বানোয়াট। কেউ বা লিখলো ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা বলেছেন, তাই তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। বিশ্বজুড়ে মুদ্রা-স্ফিতি, অথচ এসব সাংবাদিক সে কথা ভুলে, শুধু বাংলাদেশের কথা লিখতেন—সরকারী ব্যর্থতার জন্য জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশকে গড়ে তুলতে হলে যেসব কার্যব্যবস্থার দ্বারা দেশ উপকৃত হতো সরকার কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারত, এসব সংবাদপত্র আর সাংবাদিক সে সব বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন না করে গুজব, অসত্য তথ্য পরিবেশন করতেন তাদের বিরুদ্ধে। এনায়েতুল্লাহ খান সব সংবাদপত্র

বন্ধ করে স্বল্প কিছু সংবাদপত্র রাখার সুপারিশ করেন এবং বঙ্গবন্ধুকে প্রভাবিত করেন। এই এনায়েতুল্লাহ পনের আগষ্টের পরে জেনারেল জিয়ার সমর্থনে এগিয়ে আসেন, তার শিক্ষামন্ত্রী হন। এরশাদের সময় রাষ্ট্রদূত। কেমন সমাজদরদী সাংবাদিক। শুধু আখের গোছাতে সিদ্ধ হস্ত। সাংবাদিক আবদুল হামিদ সি আই এ এর দোস্ত, বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থানে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ আমদানী করেন এবং জিয়াকে দিয়ে তা কার্যকরী করান। ফলে দেশ এখন দু'ভাগে বিভক্ত। বাঙালি, বাংলাদেশী-জয়বাংলা জিন্দাবাদ হয়।

ছয়. রাজনৈতিক দলগুলোর ভুল ভূমিকা :

নির্বাচনে বার বার পরাজিত রাজনৈতিক দলগুলি জনগণের নিকট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ক্ষমতালোভী এসব দলগুলি যোগ দেয় ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে। পনের আগষ্টের পর রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ থাকলেও অনেক রাজনৈতিক নেতা জিয়াউর রহমানের সঙ্গে যোগ দেন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ, চরম পন্থীদল গুলো, এবং এসব দলের ছত্রছায়ায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সামরিক জান্তার দালাল দলগুলোর নেতা ও কর্মীরা মুজিব হত্যার বিচার চাওয়াতো দূরে থাক এ হত্যাকাণ্ডটিকে তারা নাজাত দিবস হিসাবে ঘোষণা করে এবং সামরিক সরকারকে সব রকম সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। প্রবীন রাজনৈতিক নেতা আতাউর রহমান খান, হাজী দানেশ-যারা বাকশালে যোগদান করেছিলেন, সামরিক সরকারের পক্ষে যান এবং পনের আগষ্ট হত্যাকাণ্ডকে স্বাগত জানান। লক্ষনীয় বিষয় যে শুধু বিরোধীতা আর স্বার্থের খাতিরে তারা একটা অগণতান্ত্রিক কার্যব্যবস্থা তথা ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করেন। রাজনৈতিক দলগুলির ভুল সিদ্ধান্ত তথা কার্যকলাপের জন্য শুধু মুজিব হত্যার বিচার ক্ষতিগ্রস্থ হয় নাই, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে একনায়কতন্ত্রে পরিগণিত করে। দেড় যুগ পরে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারলেও সত্যকে স্বীকার করবার সৎ সাহস তাদের নাই। আর এ জন্যই মুজিব হত্যার বিচার হচ্ছে না। দেশে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা পথ পাচ্ছে না।

সাত. জনগণ হতবাক, বিহবল এবং দিশেহারা হয়েছিল :

বঙ্গবন্ধু বলতেন, কোনো বাঙালি তাকে হত্যা করবে না। সেই বাঙালিই তাকে হত্যা করলে বাংলার জনগণ প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে নি, পরে হতবাক, বিহ্বল দিশেহারা হয়ে গেছে। তাদের যখন চমক ভাঙ্গে তখন

দেশে সামরিক শাসন, সান্ধ্য আইন। ধর-পাকর, হত্যা এমনি হাজার গ্রাস রাজত্ব কায়েম হয়েছে। মুজিবের নাম নিলেই গুলি বা জেল। অবস্থা বাস্তবের চেয়েও ভয়াবহ। দেশবাসী ভাবতে থাকে যারা তাকে হত্যা করেছে তারা কি বাঙালি? অবশ্য তারা বাঙালির ঔরসে জন্মগ্রহণ করলেও বাংলার আকাশ বাতাস জলবায়ু ধুলোবালির সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। পরবর্তীতে তারা নিজেরাও প্রমাণ করেছে যে, তারা বাঙালি নন বাংলাদেশী। তারা গুলশান বনানীর বাসিন্দা, শোষক শাসক, নরঘাতক পাকিস্তানী দালাল সাম্রাজ্যবাদীর দোসর। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে একটা গুজব ছড়ানো হয় যে বাকশালের সকল সদস্যকে হয় হত্যা করা হয়েছে নয়ত বন্দী করা হয়েছে। লোকেরা প্রথমে বিশ্বাস করে নাই, পরে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অধিকন্তু সামরিক শাসন ও সান্ধ্য আইন জারীর ফলে লোকজন প্রতিবাদ করার সুযোগ পর্যন্ত পায়নি। খোদ সেনানিবাসে সৈনিকরা পর্যন্ত শেখ সাহেবের নাম কিংবা মুক্তিযুদ্ধের কোনো আলাপ করতে পারত না। জিয়ার সমর্থক গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা বিনা নোটিশে যে কাউকে ধরে নিয়ে যেত। তদুপরি খোন্দকার মোশতাক কর্তৃক সরকার গঠন এবং বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের অন্তর্ভুক্তির জন্যও লোকজন বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। বাইরে গুজব ছিল যে, তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আহমেদ, তোফায়েল, রাজ্জাক ও মনিকে হত্যা করা হয়েছে। এসব গুজবে লোকজন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না যে পনেরই আগষ্ট রাত্রিতে এবং তার পরের দিনগুলিতে ঠিক কি ঘটেছিল। অধিকন্তু বঙ্গভবন ও সচিবালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ট্যাংক, কামান দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় সার্বিক পরিস্থিতিও ছিল ঘোলাটে।

আট. জিয়া—এরশাদ সেনাচক্র :

ক্ষমতা দখলের নীল নকশা ছিল অনেক দিনের। পাক প্রত্যাগত সৈন্যরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সংখ্যাধিক্য ছিল। তখনকার অবস্থার প্রেক্ষিতে সৈন্যদের সরকার বিরোধী অনেক তথ্য সরবরাহ করা হয়। বিশেষ করে সৈন্যবাহিনীর স্থলে রক্ষীবাহিনী স্থলাভিষিক্ত হবে এই ভয়ে সৈন্যরা আতঙ্কিত ছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তাদের চাকুরী হারাবার ভয় দূর হয়। তাই তারাও মুজিব হত্যার বিচার না হবার পক্ষে অবস্থান নেয় অর্থাৎ জিয়াকে সমর্থন দেয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যা আসলে একজন বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বে প্রত্যাগত সৈনিকদের সমর্থনে হয়েছিল—তারা ছিল সাঁজোয়া (বেঙ্গল ল্যান্সার) এবং গোলন্দাজ (২ ফিল্ড আর্টিলারী) ইউনিটের সৈন্যরা। এরা প্রায় সবাই পাকিস্তান থেকে আগত সৈনিক ছিল। এ অভ্যুত্থান কতকটা

মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অমুক্তিযোদ্ধা বা পাকিস্তান প্রত্যাগত সৈনিকদের সমর্থনে হয়েছিল। আর এদের নাটের গুরু ছিলেন জেনারেল এইচ এম এরশাদ। যদিও ঘটনার সময় তিনি দূরে ছিলেন। কিন্তু কলকব্জা তার ঠিকমতই চলছিল।

নয়. আন্তর্জাতিক সমর্থন না পাওয়া :

যেহেতু এ হত্যাকাণ্ডটি ছিল আমেরিকা—পাকিস্তান গোষ্ঠির আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, সেহেতু এ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া যায় নি। বরং ভোয়া বিবিসি, এসব বিদেশী সংস্থাগুলি এ হত্যাকাণ্ডের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। তারা ইতিহাস বিকৃত করে প্রচার করেছে—মুজিব স্বাধীনতা চায় নাই, জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেশ স্বাধীন করেছে। মুজিব না জিয়াই স্বাধীনতার আসল লোক। ফলে লোকজন বিভ্রান্ত ও হতাশগ্রস্ত হয়। মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠতে পারে নাই।

দশ. ইনডেমনিটি বা নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধানকারী অধ্যাদেশ ১৯৭৫ :

দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্র এবং দেশবাসীর বিভ্রান্তের সুযোগে বঙ্গবন্ধুর হত্যার একমাস দশ দিন পরে সি আই এ-এর তৈরী ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জেনারেল জিয়া সুকৌশলে বঙ্গভবনের মেজর চক্রের হাত দিয়ে খোন্দকার মোশতাকের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ সহ কতিপয় সংস্থা বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের দাবী করলেও সেসব দাবী সংবাদপত্রে, রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করা হয় নাই বরং যারা বিচার দাবী করেছে তাদের হয় হত্যা নয়তো নির্যাতন করা হয়েছে। অবশেষে জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের ৫ই এপ্রিল ৫ম সাংবিধানিক সংশোধনে ১৯৭৫ সালের ইনডেমনিটি বিল অন্তর্ভুক্ত করে বঙ্গবন্ধুর বিচার পথ স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেন। পঞ্চম সংশোধনীর পর ৬ই এপ্রিল ১৯৭৯ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার করতে হলে এই কাল আইন বাতিল করতে হবে। তবে বঙ্গবন্ধু হত্যার পক্ষের সরকারগুলো ক্ষমতায় থাকার জন্য এই আইন বাতিল করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ফরহাদ মাজহারের কথায় 'বঙ্গবন্ধু হত্যা বড় জঘন্য অপরাধ, তার বিচার না হওয়া তার চেয়ে আরো ঘৃণ্য অপরাধ। মুজিব হত্যার বিচার হলেই দিল্লিওয়ালা আর মার্কিনওয়ালাদের আমরা চিনবো এবং তাদের আঁতাতের রশিটাও পরিষ্কার হবে।"[১৯]

এগার. মূল হত্যাকারী চিহ্নিত করতে না পারা :

এ যাবত বঙ্গবন্ধুকে হত্যা কে করেছে সেটাই ঠিক মতো চিহ্নিত করতে না পারায় তার বিচার দাবীও সঠিকভাবে করতে পারে নাই। সত্য কথা বলতে কি, আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীরা এ যাবত খোন্দকার মোশতাক আহমদকে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী বলে দাবী করে আসছেন। এজন্য দেশ বিদেশে খুনী মোশতাক বলা হচ্ছে। ওদিকে তিনি বারবার সে দাবী প্রত্যাখ্যান করছেন। তবুও নেতাদের টনক নড়ে নাই। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী হচ্ছেন বঙ্গবীরের কথায় "ডার্ক হর্স'-কিসিঞ্জারের জানের জান, ভুট্টোর প্রাণের প্রাণ মহাপাতক জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তম পি এস সি। সুবেদার লতিফের কথায়—বাংলার মোনাফেক। সুবেদার আফতাবের কথায়—বাংলার কলঙ্ক। এসবের চেয়ে তার কর্মফলের জন্য তাকে বিষবৃক্ষ বলাই শ্রেয়।

বার. খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার কারণ :

বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার তথা তদানিন্তন সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মেজর খালেদের নেতৃত্বে একটি সেনাঅভ্যুত্থান ঘটে ২রা নভেম্বর ১৯৭৫। অভ্যুত্থানটি তড়ি-ঘড়ি করে সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকায় জনসমর্থন তথা কৌশলগত কারণে ব্যর্থ হয়। ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ পাল্টা আর একটি সেনাঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফ তার কমরেডদেরসহ মৃত্যুবরণ করেন এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান পুনরায় ক্ষমতায় সমাসীন হন। পনের আগষ্ট তারিখে ১৮ জন জল্লাদসেনা দ্বারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও লোভ-লালসা এবং ক্ষমতার মোহ ক্রমাগতভাবে প্রথমে সেনাবাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের মধ্যে, পরে জুনিয়রদের মধ্যে থেকে সমাজের সর্বস্তরের বিত্তবানদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। তাদের হীনস্বার্থে তাদের জাতীয় পরিচয় পর্যন্ত বদলিয়ে ফেলে। এদের বিরুদ্ধে পর পর ২৪টি বিদ্রোহ ঘটেছে। তাদের বিরুদ্ধে পালটা অভ্যুত্থান ঘটেছে কিন্তু ক্ষমতা তাদের হাতেই রয়েছে এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার সাধারণ বিচার দাবী

শেখ মুজিবকে যারা হত্যা করেছে তাদের নিকট জিজ্ঞাস্য :

১. শেখ মুজিব যদি বাঙালি জাতির ক্ষতি করেন, অন্যায় করেন, তবে তার হত্যার বিচার করলে তথ্যভিত্তিক প্রমাণে আরো সুবিধা হবে তাকে দায়ী করতে ?
২. ১৯৭৫ সালে দেশে কত জন গরিব ছিলো এখন কত ?
৩. ১৯৭৫ সালে দেশে কতজন কোটিপতি ছিলেন আর এখন কত ? এদের দলীয় অবস্থান কি ?
৪. ১৯৭৫ সালে প্রতিদিন কত জন হাইজ্যাক, হত্যা, খুন, ধর্ষণের শিকার হতো আর এখন কত ?
৫. ১৯৭৫ এ কতজন পদাতিক, নৌ ও বিমান সেনা ছিল—এখন কত ?
৬. ১৯৭৫ এ কতজন ডাক্তার ছিলেন—এখন কত ?
৭. ১৯৭৫ এ কতজন পুলিশ ছিলেন—এখন কত ?
৮. ১৯৭৫ এ কতগুলি বাণিজ্যিক ব্যাংক ছিল—এখন কত ?
৯. ১৯৭৫ এ কতগুলি প্লেন ছিল—এখন কত ?
১০. ১৯৭৫ এ কতগুলি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি ছিল—এখন কত ?
১১. ১৯৭৫ এ বাজারে বিদেশী মালের পরিমাণ কি ছিল আর এখন কত ?
১২. ১৯৭৫ এ ভারতের সঙ্গে কি পরিমাণ চোরাচালানী হত আর এখন কত?
১৩. ১৯৭৫ এ বৈদেশিক মুদ্রা কত ছিল আর এখন কত ?
১৪. ১৯৭৫ এ কত মাইল পাকা রাস্তা ছিল আর এখন কত ?
১৫. ১৯৭৫ এ উন্নয়ন হার কত ছিল আর এখন কত ?
১৬. ১৯৭৫ এ রাজনৈতিক কোন্দল কেমন ছিল আর এখন কেমন ?
১৭. জেলে জাতীয় নেতাদের হত্যার হুকুম কে দিয়েছিল এবং তাদের হত্যার বিচার হল না কেন ?
১৮. সিরাজ শিকদারের হত্যার পুনঃ বিচার হল না কেন ?
১৯. জিয়া হত্যা বিচারের দলিল প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন ?
২০. ১৯৭৫ এ আমলা কোটিপতি কত ছিল আর এখন কত ?
২১. গুলশান, বারিধারা, বনানী, গ্রীন রোড, বেলী রোড, ধানমণ্ডীতে যারা বাস করেন তারা আয়কর কত দেন ?
২২. ১৯৭৫ এ ভূমিহীন কত ছিল আর এখন কত ?
২৩. ১৯৭৫ এ নারী নির্যাতনের হার কত ছিল আর এখন কত ?
২৪. মোশতাক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী হলে, খুনী হিসাবে তার বিচার না করে দুর্নীতির দায়ে বিচার হল কেন ?
২৫. বঙ্গবন্ধু হত্যার-ষড়যন্ত্রকারীরা এখন উল্টাপাল্টা বলছে কেন ?
২৬. ১৯৭৫ এ একজন নাগরিকের বৈদেশিক ঋণ কত ছিল এখন কত ?

তথ্য-নির্দেশ

১. ভোরের কাগজঃ ১৫ই আগষ্ট ১৯৯৩, মুন্নী সাহার সাক্ষাৎকার।
২. একজন সোয়ার যা বলেছেন।
৩. বঙ্গবন্ধু মুজিবকে ঘিরে কিছু কথা-ডঃ এম এ ওয়াজেদ মিয়া।
৪. বঙ্গবাসী—২৬শে মার্চ ১৯৯০/১২ই চৈত্র ১৩৯৬।
৫. বাংলাবার্তা—১২ আগষ্ট ১৯৮৮।
৬. বাংলাদেশ রক্তের ঋণ—মোহাম্মদ শাহজাহান।
৭. সুবেদার (অবঃ) আবদুর রশীদ এর বক্তব্য।
৮. ভোরের কাগজ—১৫/১৬ই আগষ্ট ১৯৯৩ জেনারেল সফিউল্লাহ—এর সাক্ষাৎকার।
৯. ফসল—১৬ই মার্চ ১৯৯০/মাহফুজ পারভেজ/সাখাওয়াত স্বপন।
১০. এই সময়—২৬শে মার্চ ১৯৯০ আবদুল গাফফার চৌধুরী।
১১. যায় যায় দিন—১৭ই আগষ্ট ১৯৯৩/ওমর শরীফ।
১২, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড—অধ্যাপক আবু সাইয়িদ।
১৩. ইত্তেফাক—১৫ই আগষ্ট ১৯৯৩/৩১শে শ্রাবণ ১৪০০।
১৪. মেজর (অবঃ) মোঃ খুরশীদ মিরা যা বলেছেন।
১৫, স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতপর—কমর উদ্দিন আহমেদ।
১৬. আজকের কাগজ—১লা মাঘ ১৩৯৮ ওয়ারেছ হোসেন বেলাল, বীর প্রতীক।
১৭. আজকের কাগজ—১৯শে পৌষ ১৩৯৯/২রা জানুয়ারি ১৯৯৩।
১৮. রাজপথ—৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যা।
১৯. আজকের কাগজ—১৯শে ভাদ্র ১৪০০/ফরহাদ মাজহার (মুজিব হত্যার বিচার হবে না কেন ?)
২০. সুবেদার জেড এ খান যা বলেছেন।
২১. সুবেদার আবদুস সোবহান (নোয়াখালী)—এর বক্তব্য।
২২. সুবেদার আবদুল আজিজ (ফরিদপুর)।
২৩. সুবেদার এম এ লতিফ খান (ব্রাহ্মণ বাড়িয়া)।
২৪. মেজর জামাল উদ্দিন আহমেদ (অবঃ)।
২৫. বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানী।
২৬. নূর মোহাম্মদ (বাংলাদেশ বিমান)।
২৭. আজকের কাগজ—২৬ পৌষ ১৪০১।